প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

একান্ত নির্জনেঃ গোপন আলাপ

বা

তানহায়ী কি সবক

মুফতী হাকীম আল্লামা আশরাফ আমরহী

একান্ত নির্জনেঃ

গোপন আলাপ

বা

تنہائی کے سبق

একান্ত নির্জনেঃ

গোপন আলাপ

বা

تنہائی کے سبق

মূল

মুফতী আল্লামা হাকীম আশরাফ আমরহী

অনুবাদ ও সংযোজনায়

মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক

উচ্চতর আরবী ভাষা ও সাহিত্য
জামেয়া ইসলামিয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
সাবেক মুহাদ্দিস জামেয়া ইসলামিয়া সোনারং
টঙ্গীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ।

প্রকাশনায়

রংধনু পাবলিকেশন্স

একান্ত নির্জনেঃ

গোপন আলাপ

মূল লেখক
মুফতী হাকীম আল্লামা আশরাফ আমরহী

অনুবাদ ও সংযোজনায়
মাওলানা আবুবকর সিদ্দীক

প্রকাশকাল
এপ্রিল ২০১৩

প্রকাশক
রংধনু পাবলিকেশন্স

প্রচ্ছদ
মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম

পরিবেশক
রংধনু পাবলিকেশন্স
বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ-০১৯৭৭-৩০২২৩৩

মূল্য ঃ ১২০/- (এক শ বিশ টাকা মাত্র)

EKANTO NIRJONE : GOPON ALAP
by Mufti Ashraf Amrohi, Transleted by Mawlana Abubakkar Siddique.
Published & Marketed by: Rangdhonu Pablication, Price: Tk. 120.00, US $ 4.00 only.

ISBN : 978-984-33-3775-7

এ বই পড়ার আগে

পুরুষ ঃ কথায় প্রবল কাজে দুর্বল

মহিলা ঃ বুক ফাটে মুখ ফাটে না

এ বই পড়ার পরে

পুরুষ ঃ কথায় যেমন কাজেও তেমন

মহিলা ঃ মুখ ফাটে বুক আর ফাটে না

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও লালন-পালনকারী। সেই সাথে অগণিত ও বেহিসাব দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় হাবীব খাতামুন্ নাবিইয়ীন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মোবারকের উপর এবং এ ধারা চিরকাল প্রবাহমান থাকুক।

হামদ ও সালাতের পর নাকার মোহাম্মাদ আশরাফ আমরহীর কিছু কথা, বক্ষমান কিতাবটির আলোচনাসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও জানার বিষয়। এজন্য উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করছি। জীবনের তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। কখন জানি বিদায়ের সুর বেজে উঠে। তখন নিজের ইলম, জ্ঞান-সাধনা নিজের সাথে যাবে কি না জানা নেই। সর্বোত্তম ইলম হল সেই ইলম, যার দ্বারা নিজে উপকৃত হওয়া যায় এবং অন্যরাও উপকৃত হয়। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমার তৃতীয় এই কিতাবখানি রচনার প্রয়াস। এ কিতাবে 'একান্ত গোপনীয় কথা' কিতাবের চেয়েও দামী ও দুষ্প্রাপ্য বিশেষ বিশেষ কথা সংকলন করা হয়েছে, যা শোনানোর মতো নয়, বরং নির্জনে পাঠ করে নিজের জীবন গড়া এবং সংসার জীবনের যাবতীয় সমস্যা নির্জনে সমাধান করা যাবে। আমি এ কিতাবের নাম 'একান্ত নির্জনেঃ গোপন আলাপ' রাখলাম। যেহেতু জনসম্মুখে পাঠ করার বিষয় নয়, সেহেতু আপনি নির্জনে একাকী পাঠ করে কিতাবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করুন।

আজ মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো শুকরিয়া যে, আমার জন্য খুবই খুশির সংবাদ হল, ইতিপূর্বে আমার লেখা 'একান্ত গোপনীয় কথা' নামক কিতাবটি তিনি কবুল করেছেন। আমি আশাবাদী যে আমার 'একান্ত নির্জনেঃ গোপন আলাপ' কিতাবটিও সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে।

আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস যদি পাঠকদের মধ্যে কারো সামান্যতম উপকারে আসে, তাহলে নিজের কষ্টকে সার্থক মনে করব। আল্লাহ্ তাআলা আমার এ খেদমতকে কবূল করুন। পাঠকদের প্রতি আমার আরয, যদি আপনারা এ কিতাব দ্বারা উপকৃত হন, তাহলে আল্লাহ্র দরবারে আমার গোনাহ মাফির জন্য দোয়া করবেন। আমীন।

মুহাম্মাদ আশরাফ আমরহী

সূচীপত্র

বালেগ হওয়ার আলামত

ইতিপূর্বে আমি 'একান্ত গোপনীয় কথা' বইয়ে উল্লেখ করেছি যে, সকল ব্যক্তির জন্যই প্রাপ্তবয়সে পৌঁছে বিবাহ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। বালেগ বা প্রাপ্তবয়সে পৌঁছার আলামত নিম্নরূপ—

১। জাগ্রত বা ঘুমন্তাবস্থায় স্বপ্নদোষ বা বীর্যপাত হওয়া।

২। উত্তেজনাসহ বীর্যপাত হওয়া।

৩। গুপ্তাঙ্গে পশম গজানো। যেমন- বগলের নীচে, নাভীর নীচে, নাকের মাঝে। তদ্রুপভাবে দাড়ি, গোফ গজানো অথবা ছেলেদের বয়স পনের বয়সে পৌঁছা। তেমনিভাবে মেয়েদের জন্য ঋতুস্রাব দেখা দেয়া। বর্তমানে বার/তের বছরের ছেলেদের মাঝেও জৈবিক চাহিদা প্রকাশ পাচ্ছে। মেয়েরাও এদিক দিয়ে পিছিয়ে নেই, ছোট ছোট মেয়েরাও গর্ভবতী হয়ে যাচ্ছে।

বিবাহের গুরুত্ব

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 'বিবাহ আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নত পালনে অনাগ্রহী হবে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।' অর্থাৎ সে আমার তরীকার উপর নেই। তিনি আরও বলেন 'বিবাহ হল ঈমানের অর্ধেক'। এ হাদীসের উদ্দেশ্য হল, বিবাহের পূর্বে কৃত আমলের গুরুত্ব শরীয়তে অর্ধেক। আর বিবাহের পর কৃত আমল স্বয়ংসম্পূর্ণ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ বিষয়ে আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি মহিলার অর্থ-সম্পদ প্রাপ্তির আশায় বিবাহ করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে নিঃস্ব বানিয়ে রাখবেন।' অর্থাৎ স্ত্রীর অর্থ-সম্পদ দ্বারা তাকে উপকৃত হতে দিবেন না। আর যে মেয়ের অভিজাত বংশের খেয়াল করে বিবাহ করবে, দিন দিন তার অসভ্যতা বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। আর যে যিনা ব্যভিচার থেকে বাঁচতে, নিজের মান-সম্মান বহাল রাখতে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ার উদ্দেশ্যে বিবাহ করবে, আল্লাহ তাআলা তার বিবাহে বরকত দান করবেন।

বিবাহের উপকারিতা

বুযর্গ ব্যক্তিগণ বলেন, বিবাহের পাঁচটি উপকারিতা রয়েছে। যথা-

❖ জৈবিক চাহিদা নিজ ইচ্ছাধীন থাকে।

❖ ঘর-বাড়ী সাজানো-গুছানো থাকে।

❖ সন্তানাদি জন্ম নেয়।

❖ সন্তানাদি ও স্ত্রীর খবরা-খবর নেয়ার জন্য নিজেকে সর্বদা প্রস্তুত রাখতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা হল এর দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত পালন করা হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ করেন- 'তোমরা এমন মহিলাদেরকে বিবাহ করবে, যাদের থেকে সন্তানাদি বেশি হয়। আমি যেন কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের সংখ্যাগরিষ্টতায় গর্ব করতে পারি।'

ইলমের শ্রেণী বিন্যাস ও তার গুরুত্ব

ইল্‌ম এর অর্থ হচ্ছে- জানা, জ্ঞাত হওয়া। ইলম এমন একটি প্রদীপ বা বাতি, যার দ্বারা ভালো-মন্দ, হালাল-হারাম জানা যায়। হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- 'সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য ইলমে দীন শিক্ষা করা ফরয।' আর স্ত্রী সহবাস বিষয়ক ইলমও এমন একটি ইলম, যার জ্ঞান রাখা সকল মুসলমান নারী-পুরুষের জন্য আবশ্যক। কোনো পুরুষ বা মহিলা এ জ্ঞান শিক্ষা করা থেকে মুক্ত থাকতে পারবে না। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের কথা যে, এ বিষয়ে জ্ঞানার্জনকারীকে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখা হয়। অথচ দীন-দুনিয়া উভয়টির ক্ষেত্রেই এ বিষয়ে জ্ঞান রাখা অনেক জরুরি। যদি কোনো ব্যক্তি সঠিক পথে থাকে এবং নিজে সঠিকভাবে চলে, তাহলে সে কখনো এ ইলম শিক্ষা করাকে দোষণীয় মনে করতে পারে না। কেননা সকল শ্রেণীর মানুষ, চাই সে সাধারণ হোক বা সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হোক না কেন; স্ত্রী সহবাসের প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করবেই। দুনিয়ার জীবনে বিবাহ করার গুরুত্ব অনুভব করবে। যে মহিলা আল্লাহ্ তাআলাকে রাজী-খুশি করার উদ্দেশ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, আল্লাহর নিকট সে অনেক বড় সাওয়াব প্রাপ্তির অংশীদার হয়ে যাবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম বা তার সাথে সদাচরণ করে।'

স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করতে হলেও এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা জরুরি।

আমার উস্তাদ, শায়খ বা পীর আল্লামা ডাক্তার মুহাম্মাদ যাহেদ আমরহী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর কোনো এক মজলিসে বলেন, ইলম দু-ধরনের-

(১) علم الابدان (ইলমুল আবদান) বা শরীর বিষয়ক ইলম। (২) علم الاديان (ইলমুল আদইয়ান) বা ধর্ম বিষয়ক ইলম। তিনি বলেন, শরীর ও ধর্ম বিষয়ক ইলমই হল আসল ইলম। বাকি সব প্রযুক্তি বা কৌশল। শরীর বিষয়ক ইলম, ধর্ম বিষয়ক ইলমের তুলনায় অগ্রগণ্য। কেননা শরীর সুস্থ থাকলে দীনের উপর চলা ও হুকুম-আহকাম মানা অতি সহজ। পক্ষান্তরে শরীর অসুস্থ থাকলে, দীনের উপর চলা ও হুকুম-আহকাম মানা বড় কঠিন। শরীর সুস্থ থাকলে নামায পড়া, রোযা রাখা সহজ হয়ে যায়। তদ্রূপভাবে হজ্জ আদায় করা যায়। এমনকি স্ত্রী ও বাবা-মায়ের হকও আদায় করা সম্ভব হয়। আর যদি শরীর সুস্থ না থাকে, তাহলে দীন-দুনিয়ার কোনো কাজ করা সম্ভব হয় না।

সহবাস বিষয়ে জ্ঞান থাকা ও নীতিমালা অনুসরণ করা

ইলম অর্জন ও নীতিমালা অনুসরণ করে সহবাস করলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। যেমন–

১) মধ্যমপন্থায় সহবাস করলে মনে শক্তি আসে।

২) আত্মা আনন্দিত হয়।

৩) পুরুষাঙ্গ পুনরায় কাজ শুরু করার পূর্বেই প্রয়োজনীয় খাবার বা প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ পায়।

৪) অপবিত্রতা থেকে শরীর পবিত্র হয়।

৫) স্বামী স্ত্রীর প্রতি রাগ-গোস্সা কম করে।

৬) ক্রমান্বয়ে স্বামীর জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৭) সহবাসের স্বাদ উপভোগ করার দ্বারা আত্মা শান্তি পায়।

দীর্ঘদিন সহবাস না করার ক্ষতি

দীর্ঘদিন সহবাস করা থেকে বিরত থাকা ঠিক নয়। কেননা এর কারণে অনেক রোগ সৃষ্টি হতে পারে। যেমন–

১) মাথা ভারি ভারি অনুভব হয়, মাথা ঝিম ধরে।

২) মাথা চক্কর দেয়।

৩) ঘাড় ও মাথা ব্যাথা করে।

৪) মাতলামি ভাব দেখা দিতে পারে।

৫) সময়ে সময়ে পাগল হয়ে যায়।

৬) মন-মেজাজ থাকে উগ্র।

৭) শরীরে এক প্রকার অসহ্য জ্বালা অনুভব হয়।

সহবাস করার দ্বারা উপরোক্ত সাময়িক রোগ বাদ হয়ে যায়। অর্থাৎ সহবাস ছেড়ে দেওয়াতেও অনেক ক্ষতি রয়েছে। জনৈক ব্যক্তি সহবাস ত্যাগ করলে ক্ষুদামন্দা রোগে এমনভাবে আক্রান্ত হয় যে, খাবারের প্রতি তার কোনো রুচিই নেই। জীবন ধারণের জন্য কিছু খাবার গ্রহণ করলেও তা পেটে হজম হয় না। সুস্বাদু ও মজাদার খাবার খেলে এবং মাত্রায় কিছুটা বেশি হলে, পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণে থাকে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই বমি হয়। এভাবে সে দীর্ঘদিন এ রোগে আক্রান্ত থেকে এক সময় পাগল হয়ে যায়। দয়াময় আল্লাহ্ তাআলার কি অপরিসীম কুদরত যে, সহবাসের মাধ্যমে বীর্য ও উত্তাপ বের হয়ে যাওয়ায় মানুষ বিনা চিকিৎসায় সুস্থ ও সবল থাকে।

হাকীম জালিনুস বলেন, জনৈক মহিলা 'ইহতেনাকুর রেহেম' বা জরায়ু থেকে সর্বদা রক্ত নির্গত হওয়ার রোগে আক্রান্ত ছিল। অনেক বড় বড় ডাক্তার, হেকিম ও কবিরাজ দেখিয়েও কোনো ফায়দা পায় নি। পরিশেষে তিনি ঐ মহিলাকে সহবাস করার চিকিৎসা দিলেন। কিছুদিন পরই সে ঐ রোগ থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে মুক্তি পেয়ে যায়। সুতরাং সহবাস দ্বারা কেবল আনন্দ উপভোগ করাই উদ্দেশ্য নয়, স্ত্রীর সুস্থতাও উদ্দেশ্য। সহবাস শরীরে শক্তি জোগায়, শরীর পাতলা পাতলা অনুভব হয়। আবার অনেক জ্বর রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি এর দ্বারা রোগ থেকে মুক্তি লাভ করে।

সহবাসের নীতিমালা

আল্লাহ তাআলা বলেন- 'মহিলারা তোমাদের পোশাক স্বরূপ এবং তোমরাও তাদের পরিধেয় স্বরূপ।'

স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বুঝতে হবে যে, অধিক মাত্রায় খাবার খেলে যেমন পেট খারাপ হয়, অধিক মাত্রায় সহবাস করলেও শরীর দুর্বল ও সুস্থতায় বিঘ্ন ঘটে। অধিক সহবাসে পুরুষদের যে ক্ষতি হয়, মহিলাদেরও তেমন ক্ষতি হয়।

সহবাসের ইচ্ছা করলে এই দুআ পড়তে হবে–

اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান হতে রক্ষা করুন এবং আমাদের জন্য নির্ধারিত বস্তু হতে শয়তানকে ফিরিয়ে রাখুন।

উপরোক্ত দুআ সহবাসের সময় পড়লে আল্লাহ তাআলা বিতারিত শয়তান থেকে তাদেরকে হেফাজত করেন। সহবাসের সময় ঐ দুআ না পড়লে, তাদের কাজে শয়তানও শরীক হয়।

সহবাসের সময় পশ্চিমমুখি না হওয়া। কেননা কেবলা ও কা'বা শরীফের সম্মান সকল মুসলমানের অন্তরে থাকা আবশ্যক।

সহবাসের সময় স্বামী-স্ত্রী নিজেদের উপর বড় আকারের কাপড় টেনে দিবে। একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় সহবাস করা যদিও জায়েয, তবে তাতে সন্তান জন্ম নিলে অধিকাংশ সময় ঐ সন্তান নির্লজ্জ ও বেহায়া হয়ে থাকে।

সহবাসের সময়ে অধিক কথা না বলা। কেননা এতে সন্তান বোবা বা তোতলা হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। সহবাসের সময় কুরআন কারীমকে ঢেকে রাখা। যেন তার সম্মানে কোনো কমতি না আসে।

স্বপ্নদোষে অপবিত্র অবস্থায়, সূর্য উদয় ও অস্তের সময় স্ত্রী সহবাস না করা। কেননা এসব অবস্থায় বা সময়ে সহবাসের দ্বারা যেসব সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তারা অধিকাংশই পাগল বা উন্মাদ হয়ে থাকে। দীর্ঘদিন সহবাস না করলে অনেক সময় মহিলারা বিভিন্ন অসুস্থতায় ভোগেন। এজন্য এ বাক্যটি খুব স্মরণীয়–

اَلْجِمَاعُ لِلنِّسَاءِ كَالْمَرْهَمِ لِلْجَرْحِ

অর্থ– মহিলাদের জন্য সহবাস এমন, ক্ষতস্থানের জন্য মলম যেমন।

সহবাসের পর পেশাব করা খুবই জরুরি। মাটি বা হালকা গরম পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে হবে।

একবার সহবাস করার পর দ্বিতীয়বার সহবাস করতে চাইলে অযু করা। এতে মনে এক প্রকার তৃপ্তি পাওয়া যায়। স্ত্রীর লজ্জাস্থান দেখা মাকরূহ। লজ্জাস্থান দেখে সহবাসকারীর সন্তান অন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মহিলাদের ঋতুস্রাবের সময় সহবাস করা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় দিক দিয়েই ক্ষতিকর। এ সময় সহবাস করলে শরীরে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি দেখা দেয়। আবার তা হারামও। বিস্তারিত জানার জন্য 'একান্ত গোপনীয় কথা' বইটি পড়া যেতে পারে। সহবাসের পূর্ব মুহূর্তে আতর-খুশবু ব্যবহার করা জায়েয। খুশবু ব্যবহারে সহবাসে অধিক মজা ও আনন্দ পাওয়া যায়।

যৌনশক্তি বৃদ্ধির জন্য চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়েয। এর জন্য হালুয়া খাওয়া জায়েয আছে। উদ্দেশ্য হল কেবল স্ত্রীর হক আদায়ে যেন কোনো প্রকার কমতি না আসে। গুপ্তস্থানের পশম বেশি বেশি পরিস্কার রাখা। গুপ্তস্থানের পশম উপড়ান উত্তম। সম্ভব না হলে কোনোভাবে পরিস্কার রাখা।

মাসের প্রথম রাত, আমাবশ্যার রাত ও মাসের শেষ রাতে সহবাস না করাই উত্তম। কেননা এ তিন রাতে শয়তানের বিস্তার বেশি হয়ে থাকে। ঈদের রাতে, ফলদার বৃক্ষের নীচে এবং দাঁড়িয়ে সহবাস করলে আগত সন্তান অধিকাংশ নির্ভীক, বদ ও দাঙ্গাবাজ হয়ে থাকে। চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের রাতে, রাতের অন্ধকার নেমে আসার সময়, রাতের প্রথমাংশ যখন খাবারে পেট ভরপুর থাকে, এসব সময়ের সহবাসে সন্তান হলে অধিকাংশ সন্তান বে-আকল ও নির্বোধ হয়ে থাকে।

কক্ষে সন্তান বা আরেক সতীন নিদ্রায় থাকাবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাসে সন্তান হলে অধিকাংশ সন্তান ব্যভিচারের খাছলত নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

গর্ভবতী স্ত্রীর সাথে অযুবিহীন হালতে সহবাস না করা। এতে আগত সন্তান কৃপণ ও কঞ্জুস স্বভাব নিয়ে জন্ম নেয়।

সহবাসের পর পরই ঠাণ্ডা পানি বা ঠাণ্ডা কোনো জিনিস ব্যবহার না করা। কেননা সে সময় সম্পূর্ণ শরীর গরম থাকে, ঠাণ্ডা কিছু পেলে সে খুব দ্রুত গ্রহণ করে। ফলে মুখ ঝলসানো, কাঁপুনি, দুর্বলতা ও ফুলা রোগ হয়ে থাকে।

সহবাসের পর উভয়ের গুপ্তস্থান ভিন্ন ভিন্ন নেকড়া দিয়ে পরিস্কার করতে হবে। এক কাপড় দ্বারা পরিস্কার না করা। এতে পরস্পরের মাঝে অমিল ও দুশমনী সৃষ্টি হতে পারে। অপবিত্র অবস্থায় কোনো কিছু খাওয়া ও পান করা উচিত নয়। কেননা এর দ্বারা অভাব-অনটন দেখা দিতে পারে। উত্তম হল সহবাসের পর গোসল করে খাওয়া-দাওয়া করা। গোসল সম্ভব না হলে কমপক্ষে অবশ্যই অযু করা উচিত।

ভরপেটের সহবাসে সুগারের রোগ দেখা দিতে পারে। এজন্য রাতের শেষ প্রহরে সহবাস উত্তম। আদাবুস সালেহীন কিতাবে রাতের প্রথম দিকে সহবাস করতে নিষেধ করা হয়েছে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে যে কোনো দিন সহবাস করতে পারবে। এতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে যৌনবিদ ও বুযুর্গগণ যেসব দিনে সহবাস করতে নিষেধ করেছেন সেসব দিনে সহবাস না করাই উত্তম।

জুমার রাতে সহবাস করা সর্বোত্তম। নবীগণ, আওলিয়াগণ, উলামায়ে কেরাম, হেকিমগণ এবং এ বিষয়ে বিজ্ঞ ডাক্তাররা জুমআর রাতে সহবাস করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

জুমআর রাতে সহবাস করার দ্বারা যে সন্তান জন্ম নেয়, অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, তারা সাধারণত সৎ, নেককার, আবেদ, পরহেযগার হয়ে থাকে।

ঋতুস্রাব ও নেফাস চলাকালিন স্ত্রী সহবাস করা মারাত্মক গোনাহ। ঘটনাক্রমে যদি সহবাস হয়ে যায়, তাহলে খাছ দিলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং সম্ভব হলে কিছু দান সদকা করা উচিত।

যার স্ত্রী অধিক সুন্দরী ও রূপসী, তার সহবাস করার মজাটাই ভিন্ন। এর দ্বারা যদিও বীর্য তুলনামুলক বেশি নির্গত হয়, তবুও তার প্রতি আসক্তির কারণে আত্মার মাঝে এক ধরণের শান্তি অনুভব হয়। আত্মার এ প্রশান্তির দ্বারা বীর্যও বেশি বেশি সৃষ্টি হয়ে থাকে।

যার স্ত্রী নাবালেগ বা সবেমাত্র যৌবনে পদার্পন করেছে, এমন স্ত্রীর সাথে সহবাস না করা। তদ্রুপভাবে স্ত্রীর মন মেযায ভালো না থাকলে বা যেসব স্ত্রীর মুখে দুর্গন্ধ রয়েছে, তাদের সাথেও সহবাস না করা উচিত। স্ত্রী যদি একেবারে হালকা পাতলা ও দুর্বল হয় এবং সহবাসের প্রতি তার কোনো আগ্রহ না থাকে, তাহলে তার সাথে সহবাস করবে না। যেসব অবস্থায় সহবাস করা নিষেধ নিম্নে তা উল্লেখ করা হল–

যেসব অবস্থায় সহবাস করা অনুচিত

❖ মহিলাদের মাসিক বা ঋতুস্রাব অবস্থায়।

❖ নিফাস (অর্থাৎ মহিলাদের বাচ্চা প্রসবের পর চল্লিশ দিন বা এর কমে যে কয়দিনে রক্ত আসা পরিপূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়) অবস্থায়।

❖ কাজের ব্যস্ততা বেশি থাকলে সে সময়।

❖ চিন্তা-ভাবনা, পেরেশানী ও বিচলিত অবস্থায়।

❖ দুর্বল ও ক্লান্ত অবস্থায়।

❖ মাতাল অবস্থায়।

❖ পেশাব-পায়খানার চাপ থাকা অবস্থায়।

❖ একেবারে খালি পেটে অথবা ভরপেটেও সহবাস না করা।

❖ যাদের গনোরিয়া রোগ রয়েছে, তাদের জন্যও অনুচিত।

❖ প্লেগরোগ, অসুস্থ অবস্থা ও জীবাণুযুক্ত বাতাস প্রবাহের সময়।

উপরোক্ত বিষয়গুলো এই বইয়ে সংক্ষিপ্তাকারে এবং 'একান্ত গোপনীয় কথা' বইতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিচে উল্লেখ করা হল−

❖ দেখতে অসুন্দর, যার সাথে মনের মিল হবে না বা যার প্রতি মনের কোনো প্রকার চাহিদা নেই, এমন মেয়েকে বিবাহ না করা। এজন্যই বিবাহের পূর্বে মেয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে। যে স্ত্রীর প্রতি মনের কোনো প্রকার চাহিদা জাগে না, তার সাথে সহবাস করলে পুরুষের শরীরে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। হযরত লোকমান হাকীম তার ছেলে আরজমন্দ কে নছীহত করেছিলেন যে, বদছুরত মহিলা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। কেননা, সে নিজে বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তোমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিবে।

❖ অসুস্থ স্ত্রীর সাথে এজন্য সহবাস করবে না যে, তার মন মানসিকতা আপাতত সহবাসের প্রতি আগ্রহী নয়। এ ছাড়াও তার রোগে স্বামীর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

❖ বৃদ্ধা মহিলার সাথেও সহবাস না করা। কেননা, তার সাথে সহবাসের দ্বারা পুরুষের লিঙ্গে দুর্বলতা সৃষ্টি হতে পারে। বৃদ্ধার লজ্জাস্থান শুকনো ও ঢিলে হওয়ার কারণে সহবাসে পুরুষরা তেমন একটা মজা অনুভব করে না। আর মজা কম অনুভব করার দ্বারা পুরুষদের সহবাসের আগ্রহে বিঘ্ন ঘটে। যা তাকে ধিরে ধিরে সহবাসে দুর্বলমনা বানিয়ে দেয়। বৃদ্ধাদের লজ্জাস্থানের ভিতরে সবসময় ঠাণ্ডা থাকে যা পুরুষাঙ্গের জন্য ক্ষতিকর। কেননা সহবাসের পর ঠাণ্ডা পানি বা ঠাণ্ডা কিছু ব্যবহার করাই নিষেধ। সুতরাং সে স্থানে সহবাসে পুরুষরা অবশ্যই ক্ষতির সম্মুখিন হবে। আরেক ক্ষতির দিক হল, মহিলা বৃদ্ধা হয়ে যাওয়ার কারণে তার জরায়ু পুরুষের বীর্যকে খুব চুষে থাকে, ফলে পুরুষের চেহারায় ঔজ্জল্যতা হ্রাস পাওয়ার আশংকা রয়েছে এবং দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। তবে বৃদ্ধা মহিলা যদি দেখতে অপরূপা ও সুন্দরী হয়, যাকে দেখলে এখনও সহবাসের ইচ্ছা জাগে, তার সাথে সহবাসে ক্ষতির সম্ভবনা কম।

বি.দ্র. মহিলাদের বয়স যখন পঞ্চাশের উর্ধে চলে যায়, তখনই তারা বৃদ্ধের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

❖ নর্তকী, বাজারী বা বেশ্যা নারীর সাথে সহবাসে এইডস নামক মারাত্মক রোগ দেখা দিতে পারে। অনেক মানুষের বীর্য এসব নারীদের

লজ্জাস্থানে নির্গত হয় এবং এর প্রভাবে বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ সৃষ্টি হয়, যার প্রতিক্রিয়া ও ক্ষতি সন্তানাদির উপরও পড়ে।

❖ হামেলা বা গর্ভধারীনি নারীর সাথেও সহবাস না করা। বিশেষ করে গর্ভবতী হওয়ার প্রথম থেকে তৃতীয় মাস পর্যন্ত এবং অষ্টম থেকে সন্তান জন্মগ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত সহবাস না করা উচিত। এ সময়ে বাচ্চাদানিতে নাড়াচাড়া মাত্রাতিরিক্ত হলে অনেক সময় গর্ভপাত হয়ে যায়। বিশেষ করে যে পুরুষদের লিঙ্গ বেশ লম্বা তারা যদি গর্ভবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করেন, তবে অধিকাংশ মহিলার গর্ভপাত হয়ে যেতে পারে। কেননা গর্ভাবস্থায় মহিলাদের লজ্জাস্থানে গরমের ভাব তুলনামুলক বেশি থাকে। এর সাথে যদি সহবাসের গরম যোগ হয়, তাহলে অতি সহজেই গর্ভপাত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

❖ যেসব মহিলাদের মুখে দুর্গন্ধজাতীয় রোগ রয়েছে, তাদের সাথেও সহবাস না করা উচিত। কারণ ক্ষুধা ও পিপাসার সময় মুখের দুর্গন্ধ আরো বৃদ্ধি পায়। আর মুখের এ দুর্গন্ধ স্বামীর মনে সহবাসের সুপ্ত খাহেশ হ্রাস পেতে থাকে এবং তার পুরুষত্বে দুর্বলতা দেখা দিয়ে থাকে।

❖ যে স্ত্রী অধিক সময় স্বামীকে নিজের কাছে রেখে তাকে চুম্বন করে, জড়িয়ে ধরে যৌন আকর্ষণে লিপ্ত রাখে, কিন্তু সহজে সহবাস করতে দেয় না। বরং স্বামী সহবাস ব্যতিত বাকী সব আনন্দ দিয়ে মাতোয়ারা করুক এবং শেষ পর্যায়ে সহবাস করুক। স্বামীকে এমন যৌনকাজে লিপ্ত রাখলে, অনেক সময় স্বামীর বীর্যপাত হয়ে যায়। আর এমন হলে স্বামীর মনে দ্রুত বীর্যপাতের ভয় ঢুকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কেননা পুরুষের সব সময়ই যৌন চাহিদা জেগে থাকে এবং পুরুষাঙ্গের রগসমূহ স্ফীত হয়ে যায়। সহবাসের পূর্বেই স্বামীর বীর্যপাত হলে মানসিক চিন্তা বেড়ে যায় এবং লজ্জিত হয়ে নিজেকে দুর্বল পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতে থাকে। স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে তার এ বিষয়টির স্মরণে সে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে। মানসিকভাবে দুর্বল পুরুষের বীর্যপাত খুব দ্রুত হয়ে যাবে।

যাদের জন্য সহবাস করা ঠিক নয়

❖ যাদের পুরুষাঙ্গ দুর্বল, তাদের স্ত্রী সহবাস করা ঠিক নয়।

❖ কাঁপুনি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সহবাস করা অনুচিত।

❖ দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, গোস্সা কিংবা শারীরিক মেহনতের কারণে ক্লান্ত থাকাবস্থায় সহবাস করা অনুচিত।

- ❖ যাদের যৌন চাহিদা একেবারেই কম।
- ❖ যাদের দৃষ্টিশক্তি একেবারেই কম।
- ❖ যাদের হজমশক্তি খুবই দুর্বল।
- ❖ যাদের বীর্য পানির ন্যায় তরল।
- ❖ যাদের বক্ষ একেবারে অপ্রশস্ত।

উপরোক্ত ব্যক্তিরা বেশি বেশি সহবাস করলে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখিন হওয়ার অধিক সম্ভবনা রয়েছে।

যেসব অবস্থায় সহবাস করা ঠিক নয়

❖ ভরপেটে সহবাস করা অনুচিত। এ সময় শরীর খাদ্য হজমে ব্যস্ত থাকে। যদি এ অবস্থায় সহবাস করা হয়, তবে হজমে ত্রুটি হবে। ফলে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হবে। যৌনবিদদের অভিমত হল, রাতের প্রথমাংশে সহবাস না করা উত্তম। কেননা এ সময় পাকস্থলী খাদ্যে ভরপুর থাকে।

❖ খালি পেটেও সহবাস না করা। কেননা অণ্ডকোষদ্বয় বীর্য মূত্রথলী থেকে সন্ধান করে। আর মূত্রথলী তার খাদ্য কলিজা থেকে সংগ্রহ করে। আর কলিজা পাকস্থলী থেকে সংগ্রহ করে। সহবাসের সময় যদি পাকস্থলী খালি থাকে, তবে সহবাসের দ্বারা শরীর একেবারেই দুর্বল হয়ে যাবে। শরীরের দুর্বলতা যৌনচাহিদা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। ধীরে ধীরে শরীরের শক্তি হ্রাস পায়। মনের ধুকধুকানী রোগ সৃষ্টি হয়। খালি পেটে সহবাস করা ভরপেটে সহবাস করার চেয়েও অধিক ক্ষতিকর।

নিম্নোক্ত অবস্থাতেও সহবাস করা অনুচিত

পেটে বদ হজম হলে সহবাস উচিত নয়। দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, চিন্তা, লজ্জা-শরমের অবস্থাতেও সহবাস উচিত নয়। অধিক মেহনতের পর, অধিক গরমের সময়ও সহবাস অনুচিত। কেননা, এসব অবস্থায় সহবাস করলে নিজেকে কিছুক্ষণের জন্য বিরত রাখতে হয়। অন্যথায় শরীর একেবারে ক্লান্ত হয় এজন্য মন তখন আরাম চায়, কোনো প্রকার কষ্ট বা মেহনত করার প্রতি আগ্রহ থাকে না। যেহেতু শরীরে প্রচণ্ড চাপ পড়ে এবং পেরেশানী বৃদ্ধি পায়, যা মনের চাহিদার বিপরীত। তাই এ অবস্থায় সহবাস না করাই উত্তম।

ঘুম ঘুম ভাব অবস্থায় সহবাস উচিত নয়। বিভিন্ন চিন্তায় ঘুম না আসলে সহবাসের মাধ্যমে নিজেকে দুর্বল বানিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করা অনুচিত। কেননা, ঘুম এমন বিষয় যা শরীরের যাবতীয় ক্লান্তি দুর করে। কিন্তু সহবাস ক্লান্তি তৈরি করে। দেমাগ ও শরীর যখন আরাম চায়, তখন সহবাস করে নিজেকে ক্লান্ত বানানো ঠিক নয়।

বমির পর, দাস্ত বা পাতলা পায়খানার পর, অম্ল বা তিক্ত ফল খাওয়ার পর এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরপরই সহবাস অনুচিত।

শরীর খুব ঠাণ্ডা অবস্থায় সহবাস না করা। এ সময়ের সহবাসে বেশিক্ষণ অবস্থান করা যায় না এবং মরদামী শক্তি কমতে থাকে।

স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিত বা অসম্মতিতে তার সাথে সহবাস অনুচিত। মাঠে, চাঁদনী রাতে, অন্ধকারে, মাসের পনের ও শেষ তারিখ এবং সহবাসের পরই আবার সহবাস অনুচিত। যতক্ষণ না নতুন যৌনশক্তি সৃষ্টি হয়।

মাতাল ও নেশার শেষাবস্থায় সহবাস না করা। এ সময় মানুষের চিন্তা ফিকির ও জ্ঞান-বুদ্ধি বলতে কিছুই থাকে না। এ অবস্থার সহবাসে যেসব সন্তান জন্ম নিবে তারা বেউকুফ ও নির্বোধ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

যেখান থেকে সূর্য সরাসরি দেখা যায় বা তার কিরণ সহবাসের স্থানে এসে পৌছে সহবাস অনুচিত। এতে যেসব সন্তান জন্ম নিবে, তারা সর্বদা চিন্তা ও অস্থিরতায় ভুগবে।

ফলদার গাছের নিচের সহবাসে সন্তান সর্বদা জালেম বা অত্যাচারি হয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সহবাসের দ্বারা সন্তানের চরিত্র খারাপ হয়ে থাকে।

সূর্য উদয় ও অস্ত যাওয়ার সময় সহবাসের দ্বারা যেসব সন্তান জন্ম নেয়, তারা সাধারণত চোর বাটপার হয়ে থাকে। তদ্রুপভাবে ঈদের রাতে সহবাসের দ্বারা ভূমিষ্ট সন্তান অধিকাংশ সময় খারাপ হয়ে থাকে।

যৌনবিদদের মতে কুরবানী ঈদের রাতে স্ত্রী সহবাসে যেসব সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তারা চার বা ছয় আঙ্গুলবিশিষ্ট হয়ে থাকে। বসে বসে সহবাসে সম্পূর্ণ বীর্য বের হতে পার না। এতে কিডনী বা পেটে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। পুরুষাঙ্গ ফুলা বা এমন রোগ দেখা দিতে পারে।

একপার্শ্ব থেকে সহবাস করলে মূত্রথলীতে ব্যাথা হতে পারে। কেননা, এভাবে সহবাসের দ্বারা সম্পূর্ণ বীর্য পুরুষাঙ্গ থেকে বের নাও হতে পারে। যা বিভিন্ন রোগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

উত্তম হল বিশ বছর বয়সের পূর্বে সহবাস না করা। কেননা এর পূর্বে যৌন চাহিদার পূর্ণ শক্তি পূর্ণাঙ্গভাবে সৃষ্টি হয় না। সুতরাং বিশ বছরের আগে কোনো মহিলার নিকট এবং ষাট বছর অতিক্রমের পর সহবাস থেকে নিজেকে বিরত রাখা উচিত। এসময় সাধারণত বীর্য থাকে না। হাড্ডি যখন দুর্বল হয়, তখন সহবাসে শরীর একেবারেই দুর্বল হয়ে যাবে। ভূমিকম্পের সময়, ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার পর গোসলের আগেই সহবাস অনুচিত।

বি. দ্র. উপরে উল্লেখিত বিষয়ে যত্নবান থেকে নিজেকে নিয়মতান্ত্রিক পরিচালনা করা উচিত। অন্যথায় নিজে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

সহবাস করার পদ্ধতি

সহবাস করার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। 'একান্ত গোপনীয় কথা' বইতে একাধিক পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। এখানে কেবল ঐ পদ্ধতিটি বর্ণনা করা হবে, যা স্বামী স্ত্রী উভয়ের জন্যই উপকারী ও সন্তান জন্ম নেয়ায় অধিক সম্ভাবনা রয়েছে।

সহবাসের সূচনাতেই স্বামীকে মনে রাখতে হবে যে, প্রথমে স্ত্রীর বীর্যস্খলন করাতে হবে এরপর নিজের বীর্যপাত ঘটাতে হবে। এজন্য কয়েকটি সূরত হতে পারে। যেমন—

সহবাসের পূর্বে চুম্বনে চুম্বনে পাগলীনি বানিয়ে ফেলবে, আলিঙ্গন করবে, স্তনের বোটা নাড়াচাড়া করবে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে। সুঁড়সুঁড়ি, স্তন মর্দন, মলামলি অতিরিক্ত পরিমাণে করবে। মাঝে মাঝে কামনায় ভরপুর ভাব নিয়ে তাকিয়ে থাকবে। এসবে মহিলারা উত্তেজনায় উত্তাল খেলতে শুরু করে। এক সময় সে নিজেই তার ভাব-ভঙ্গিমা দ্বারা বোঝাবে যে, আমি আর সইতে পারছি না, আমাকে কিছু একটা কর। এরপর সহবাসে লিপ্ত হবে। তখন অল্প সহবাসেই স্ত্রীর বীর্যপাত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে স্বামী নিজেকে সংযত রাখবে। অধিক উত্তেজিত হবে না, এতে সামান্য সময়ে নিজেরই বীর্যপাত হয়ে যাবে।

যেভাবে মহিলাদের কাম-উত্তেজনা জাগাতে হবে

নিম্নলিখিত উপায়গুলো অবলম্বন করলে অতি দ্রুত মহিলাদের কাম উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে। যথা–

১। মুখ, কপাল, গাল ইত্যাদি স্থানে ঘন ঘন চুম্বন ও ধীরে ঘর্ষণ করা।

২। সহবাসের পূর্বে মহিলার দেহের বিভিন্ন স্থান স্পর্শ করা। ধীরে ধীরে তা নাড়াচাড়া করলেও কাম উত্তেজনা জেগে উঠে।

৩। যৌন ইন্দ্রিয়গুলো স্পর্শ, ঘর্ষণ-মর্দন করলেও উত্তেজনা শুরু হয়ে যায়।

৪। বিশেষ করে স্তন ও ভগাঙ্কুর মর্দনে কাম উত্তেজনা জাগায় সহায়ক।

৫। প্রয়োজনে ধীরে ধীরে আঘাত, দংশন বা নিপীড়ন করা চলে।

সহবাসের আগে স্ত্রীকে ভালোভাবে উত্তেজিত করা একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় স্ত্রী অতৃপ্ত থেকে যেতে পারে।

সহবাসের গুরুত্ব

সহবাসের পূর্বে যে ঘরে সহবাস করবে সেটা খুব ভালোভাবে পরিস্কার করবে যেন কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে। ঘরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা মনে আনন্দ তৈরি করে। অপরিস্কার অগুছানো থাকলে মনে বিরক্তি ভাব দেখা দেয়। আর এ সময় সহবাস করলেও মনে তেমন একটা তৃপ্তি অনুভব হয় না। সহবাসের ঘরে যেন অন্য কোনো লোক না থাকে। অন্যের উপস্থিতি স্ত্রীকে লজ্জা শরমের পর্দায় আবৃত করে নেয়। মনে সহবাসের পূর্ণাঙ্গ সুখ অনুভব হয় না। মনে প্রফুল্লতা তৈরি হয় না।

পালঙ্কের উপর সহবাস করা যদিও উত্তম, তবে যমীনের উপর নরম তোষক বা গদি বিছিয়ে সহবাসের মজাই আলাদা। এতে পুরুষাঙ্গের মাথা মহিলাদের গুপ্তস্থানের রেহেমের সাথে অতি দ্রুত মিলে যায়।

বিছানা ও ঘর খুশবু দ্বারা সুঘ্রাণ বানিয়ে হালকা আলোর ব্যবস্থা রাখা। স্ত্রীকে নিজের বাম পাশে বসিয়ে মিষ্টি মিষ্টি রসালাপ করতে থাকা। এমন রম্য কথা বলা যেন স্ত্রীর মনেও সহবাসের প্রতি আগ্রহ জন্মে। এভাবে পুরুষের মনেও সহবাসের অধিক আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং বীর্য তুলনামুলক বেশি সৃষ্টি হয়। মিষ্টি মিষ্টি কথায় পুরুষাঙ্গে যথেষ্ট শক্তি আসে এবং তা মজবুত ও শক্ত হয়।

সহবাসের পূর্বে প্রয়োজনে স্ত্রীকে পেশাব করাবে। তবে সহবাসের পর উভয়ের জন্য পেশাব করা জরুরি।

সহবাসের সূচনা

সহবাসের সূচনা এভাবে করবে, প্রথমে স্ত্রীকে মহব্বত ভালোবাসার রসালাপ করে সহবাসের প্রতি পাগলিনী বানিয়ে ফেলবে। স্তনের বোটাদ্বয় দু-

আঙ্গুল দ্বারা ধরবে এবং আস্তে আস্তে এমনভাবে ডলাডলি করবে, যেন বোটাদ্বয় শক্ত ও স্ফীত হয়ে যায়।

মহিলাদের স্তন টিপার কারণ হল, স্তন মলা বা ডলাডলি করা যৌন উত্তেজনা সৃষ্টির অন্যতম উপায়। এবং এটির সম্পর্ক বাচ্চাদানির সাথে। স্তন স্পর্শ করার দ্বারা মহিলাদের সাথে সহবাসের প্রচণ্ড আগ্রহ তৈরি হয় এবং এর দ্বারা মহিলারাও বেশ আনন্দিত হয়।

আঙ্গুলের মাথা দ্বারা মহিলার দু-রানে হালকাভাবে স্পর্শ করে নিচের দিক থেকে উপরের দিকে টানবে এবং উপরের দিক থেকে নিচের দিকে নিয়ে যাবে। মহিলার জিহ্বা নিজের মুখে নিয়ে মহিলার নিচের ঠোঁট চুষতে থাকলে তারা অতিদ্রুত সহবাসের জন্য পাগলীনি হয়ে যায়। কিছুক্ষণ এরূপ করার পর তাদের অবস্থা যখন বেচেইন হয়ে যাবে, তখন সহবাস করলে খুব সহজেই বীর্যপাত ঘটানো যাবে। এভাবে সহবাস করলে পুরুষের পূর্বেই মহিলার বীর্যপাত হবে।

বি.দ্র. ঃ নারীর কোন্ স্থান মর্দন বা টিপলে তাদের মন খুশি হয় ও তাদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তা নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১। দুটি কাঁধ ২। মাথা ৩। স্তনবৃত্ত ৪। পাছা ৫। পিঠ

৬। স্তন দুটির মাঝখানের বোটা হালকাভাবে ডলাডলি করা।

৭। তলপেটে হালকাভাবে হাতের ছোঁয়া দেয়া।

সহবাসের পর যা করতে হবে

❖ সহবাসের পর উভয়েই কিছু সময় অবস্থান করবে। এতে মানসিক তৃপ্তি হয়। ধীরে ধীরে দেহ শীতল হয়। প্রেম-প্রীতিও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

❖ এরপর উভয়ে স্বীয় যৌনাঙ্গ ভালোভাবে ধৌত করবে। এটি অবশ্য পালনীয় তবে সহবাসের কিছুক্ষণ পর।

❖ উভয়ে ভালোভাবে গোসল করবে। গোসল না করলে মন সঙ্কোচিত হয়ে থাকে, কাজ-কর্মে প্রফুল্লতা আসে না, বরং একঘেয়েমি আসে।

❖ শর্করা মিশ্রিত এক গ্লাস পানি কিঞ্চিত লেবুর রস বা দধি কিংবা শুধু ঠাণ্ডা পানি কিছু খেতে হবে। এতে শরীরের মঙ্গল হয়।

❖ প্রয়োজনে ক্ষতিপুরক কোনো ঔষধ সেবন করা যেতে পারে।

❖ সহবাসের পর ঘুমান একান্ত প্রয়োজন।

❖ সহবাসের আগে বা পরে নেশা সেবন করা ভালো নয়। এতে দৈহিক ক্ষতি হয়। মানসিক অসাড়তা আসতে পারে।

❖ সহবাসের পর অধিক রাত্রি জাগরণ, অধ্যয়ন, শোক প্রকাশ, কলহ, কোনো দুরূহ বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তা ও মানসিক কোনো উত্তেজনা ভালো নয়।

বি.দ্র. ঃ স্ত্রী সহবাসের বিশেষ কিছু পদ্ধতি এবং দীর্ঘক্ষণ সহবাস করার তদবীর 'একান্ত গোপনীয় কথা' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

গর্ভ সঞ্চারের তরিকা

যদি কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তান নিতে চায় এবং সহবাসের দ্বারা স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্ম হোক কামনা করে, তাকে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

❖ সহবাসের পর স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ চুপচাপ বুকের উপর নিজের ওজন স্ত্রীর শরীরে না দিয়ে শুয়ে থাকবে। যেন নিজের বীর্য স্ত্রীর রেহেমের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায় এবং পুরুষাঙ্গে সামান্যতম বীর্যও অবশিষ্ট না থাকে। এ বিষয়টিও খেয়াল রাখতে হবে যে, স্ত্রীর গুপ্তস্থানে পুরুষাঙ্গ কম্পিত অবস্থায় আছে কিনা? কোনো অবস্থাতেই বাইরে বের করবে না। পুরুষাঙ্গ যখন ঠাণ্ডা ও নিস্তেজ হয়ে যাবে কিছুক্ষণ পর বাইরে বের করে আনবে। এরপর সাথে সাথেই নরম ও মোলায়েম নেকড়া দ্বারা পেঁচিয়ে রাখবে। কোনো অবস্থাতেই যেন ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে। কেননা ঠাণ্ডা বাতাস লাগার দ্বারা পুরুষাঙ্গের শিরা বা রগসমূহ দুর্বল হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর যখন পুরুষাঙ্গ একেবারে ঠাণ্ডা ও নরম হয়ে যাবে তখন ধীরে ধীরে পেঁচানো নেকড়া দিয়ে তা পরিস্কার করবে।

❖ সহবাসের পর স্ত্রীকে আধা ঘণ্টা সময় চিত হয়ে শুয়ে থাকতে হবে, কোনো নড়াচড়া করা যাবে না। নড়াচড়া করলে বীর্য রেহেমের বাইরে বের হয়ে আসার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য সে তার দুই রান দ্বারা লজ্জাস্থানকে চেপে ধরে এমনভাবে শুয়ে থাকবে যেন, সামান্য বাতাসও ভিতরে যেতে না পারে। এভাবে বীর্য বাচ্চাদানির গভীরে পৌঁছে এবং নিজের স্থান নিয়ে নেয়। এ অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লে আরো ভালো।

❖ বাচ্চাদানি এটি একটি উপুড় করা অঙ্গ। সুতরাং সহবাসের পর উঠ-বস বা নড়াচড়ায় বীর্য বের হয়ে যায়। এজন্য বাচ্চা কামনা করলে, তাকে

আল্লাহর উপর ভরসা করে চুপ চাপ দুই রান চেপে ধরে সোজা হয়ে শুয়ে থাকতে হবে। নড়াচড়া না করার ফায়েদা হল, আসলে বাচ্চাদানিতে বীর্য প্রবেশের পরই তার কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। এজন্য মহিলারা সে সময় যেমন শান্ত থাকবে, সন্তানের অবস্থানও তেমন মজবুত ও স্থায়ী হবে।

সহবাস থেকে ফারেগ হয়ে যে আমল করতে হবে

সহবাসের পর পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষকে নিম পাতার গরম পানি দ্বারা ধৌত করবে। উত্তম হল সে সময়ই গোসল করা। কেননা, গোসল করার দ্বারা শারীরিক ক্লান্তি ও দুর্বলতাভাব দূর হয়ে যায়। শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গের শক্তি পুনরায় ফিরে আসে। মনে আনন্দ লাগে, শরীরটা ফুরফুরে হয়।

গরমকালে ঠাণ্ডা পানির দ্বারা গোসলে কোনো সমস্যা নেই। তবে তৎক্ষণাৎ গোসল করতে নেই। কেননা, পানির ঠাণ্ডা পুরুষাঙ্গের শিরাসমূহকে দুর্বল বানিয়ে দেয়। সহবাসের পর ঘুম আসলে ঘুমিয়ে যাবে। এতে শরীরের ক্লান্তি ও দুর্বলতা কমে যাবে। শরীর ও মন চাঙ্গা হবে। শরীরে পূর্বের শক্তি ফিরে আসবে।

সহবাসের পর যে খাবার খেতে হবে

সহবাসের পর অবশ্যই কোনো মিষ্টি জাতীয় ফল বা খাবার খাবে। অথবা হালকা গরম ধরনের কিছু খাদ্য খাওয়া খুবই জরুরি। যেমন-গাজরের হালুয়া, ডিমের হালুয়া, মধু মিশ্রিত দুধ, বাদামের হালুয়া। খাওয়ার মতো কিছুই না পেলে শুধু মধু থাকলেও খেয়ে নিবে। একেবারে না খেয়ে থাকবে না। খাওয়ার মতো যা পাবে তা-ই খাবে।

সাবধান! সহবাসের পর কোনো ক্রমেই ঠাণ্ডা কোনো কিছু খাবে না। এমনকি ঠাণ্ডা পানিও পান করবে না। সহবাসের পরপরই গোসল করবে না। যদি অধিক তৃষ্ণা পায়, তবে কিছু সময় পরে পানি অথবা দুধ পান করবে। তবে তা অবশ্যই হাত ধৌতের পর। বর্তমানে এক ধরনের ট্যাবলেট রয়েছে, যা খেলে সহবাসে যতটুকু ক্ষতি হয়েছে তা পুরণ হয়।

সহবাসের উত্তম সময়

কোনো প্রকার বদ খেয়াল ও কু-চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সহবাসের প্রতি যখন

মন আগ্রহী হয়ে উঠবে এবং পুরুষাঙ্গ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, তখনই সহবাস করার উত্তম সময়। তদ্রূপভাবে পেটের খাবার হজম হওয়ার পরও সহবাস উত্তম। কেননা ভরপেটের সহবাসে বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে। পুরুষের বীর্য তরল ও পাতলা হওয়ার যতগুলো মাধ্যম রয়েছে, তন্মধ্যে ভরপেটে সহবাসও একটি মাধ্যম। এজন্য খাবারের দু-ঘন্টা পরে সহবাস করবে। খাবার হজমের পর যে সহবাস করা হয় এবং এর দ্বারা যদি সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে সন্তান বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, চালাক-চতুর হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

হযরত মূসা কাযিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রাতের প্রথমাংশে নয় বরং রাতের শেষভাবে সহবাস করবে। কেননা, এ সময় সহবাস করলে সব ধরণের আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যায়। দিনের তুলনায় রাতে সহবাস উত্তম। যেসব লোক সারা দিন কাজ-কামে খুব ব্যস্ত থাকে, তাদের জন্য রাতের প্রথম দিকে শুয়ে পড়া উত্তম। রাতের শুরুতে আরাম এবং শেষ রাতে স্ত্রী সহবাস করবে। ক্লান্ত ও অলস শরীরের সহবাসে সাধারণত সন্তান জন্ম নেয় না।

মহিলাদের যৌনচাহিদার আলামত

মহিলাদের মনে কখন সহবাসের আগ্রহ জাগে? এ বিষয়টি খুবই সূক্ষ্ম, যা উপলব্ধি করা বড় কঠিন। কেননা একেক নারীর যৌন চাহিদা জাগার একেক আলামত পাওয়া যায়। তবে নিম্নোক্ত আলামতগুলো অধিকাংশ মহিলাদের যৌন চাহিদা জাগার প্রমাণ হিসাবে পাওয়া যায়। যথা–

১। সময়ে অসময়ে চুল আঁচড়ান বা বেশি বেশি চুল আঁচড়ান।

২। বিনা প্রয়োজনে বক্ষ খোলা ও বন্ধ করা।

৩। স্তন আপন হাতেই মলা বা টিপা।

৪। বারংবার হাঁই তোলা বা হাঁচি দেয়া।

৫। মাঝে মাঝে উভয় হাত মাথায় ফিরান বা বুলান।

৬। নিজের ছোটো বাচ্চাকে বুকের সাথে চেপে ধরা।

৭। কোনো বাচ্চাকে নিজের বুকের [স্তনের] উপর শুয়ানো এবং আদর করা বা বাচ্চার মাধ্যমে নিজে আদর গ্রহণ করা।

৮। আঙ্গুল দ্বারা কান চুলকান।

৯। একাকী বিশ্রাম করা।

১০। হঠাৎ করে অলংকার পরিধান করা কিংবা সুরমা ব্যবহার করা।

পুরুষ ও মহিলার উত্তেজনায় পার্থক্য

সহবাসের শুরুতে পুরুষরা যথেষ্ট উত্তেজিত হয় কিন্তু একবার বীর্যপাত হয়ে গেলে পুনরায় সহবাস শুরু করলে পূর্বের মত উত্তেজনা থাকে না।

মহিলাদের উত্তেজনা ভিন্ন রকমের। সহবাসের শুরুতে বিশেষ আগ্রহ থাকে না। কিন্তু সহবাস কিছুক্ষণ চললে ক্রমশঃ তার আগ্রহ বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে পুরুষের বীর্যপাত হলেও মহিলারা সহবাসে আগ্রহী থেকেই যায়। এজন্য যৌনবিদদের অভিমত হল- মহিলাদের সাথে সহবাস করতে হলে প্রথম থেকেই সহবাস করা উচিত নয়। প্রথমে মহিলাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা দরকার, তারপর তাকে চুম্বন, দংশন, নখচ্ছেদ ও আলিঙ্গন ইত্যাদি প্রাথমিক ক্রিয়া করা উচিত।

এ সকল প্রাথমিক রসালাপ, অঙ্গ-মর্দন, অধর চুম্বন ইত্যাদিতে যখন কামেচ্ছা প্রবল হবে, তখন সঙ্গমের জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার।

পূর্ণ তৃপ্তি

এমন ঘটনা অনেকেই বলে যে, পুরুষের বীর্যপাতের পরেও নারীর সম্পূর্ণ যৌনতৃষ্ণা মিটে না। তখন এক পুরুষের বীর্যপাত ঘটলেও অন্য পুরুষকে সে কাম চরিতার্থবশত পাওয়ার ইচ্ছা করে।

পুরুষের বীর্যপাত ঘটলেই পুরুষাঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ে এবং সে আর সেই মহিলা বা অন্য নারীতে সঙ্গম করতে চায় না। কিন্তু নারীর অন্যরকম ঘটে। তার যোনিদেশ থেকে রস বের না হওয়ার পর্যন্ত তার রমন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে এ হীনমন্য নারীরা অন্য পুরুষও গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং বেশ কিছু বিলম্বে তার চরিতার্থ ঘটে। যখন তার যোনিদেশে যথেষ্ট পরিমাণে রসস্রাব ঘটে, তখনই তার তৃপ্তি হয়ে থাকে।

মহিলাদের কখন অধিক যৌন চাহিদা জাগে

নিম্নোক্ত সময়ে মহিলাদের মাঝে অন্য সময়ের তুলনায় কামভাবের চাহিদা বেশি জাগে। যথা–

১। স্বামী থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার সময়।

২। ঋতুস্রাব থেকে মুক্ত হওয়ার পর।

৩। সন্তান জন্মের চল্লিশ দিন পর।

৪। গর্ভবতী হওয়ার দুই মাস পর।

৫। উলঙ্গ ফটো বা ফিল্ম দেখার সময়।

৬। নাচ-গান শোনার সময়।

৭। শীতকালে যখন একাকী শুয়ে থাকে।

৮। বৃষ্টি হওয়ার সময়।

৯। বাগান, উদ্যান ও পার্কে সময় কাটানোর সময়।

১০। পর পুরুষের প্রশংসা শুনলে।

১১। কারো নিকট সহবাসজনিত কথা শুনতে থাকলে।

১২। পুরুষে স্পর্শ করলে কিংবা জড়িয়ে ধরলে।

১৩। গহনা, অলঙ্কার কিংবা ভালো পোষাক পরিধান করলে।

১৪। আতর, খুশবু, সেন্ট ইত্যাদি ব্যবহার অবস্থায়।

১৫। গোসলখানায় একাকী গোসল করার সময় নিজের শরীরের গঠনের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালে।

মধ্যমপন্থায় সহবাস করবে

খাবার দাবারে যেমন মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হয়। ঠিক সহবাসের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। অধিক সহবাস স্বাস্থ্যের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমন একেবারে কম সহবাস করাও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। যৌনশক্তির দিক দিয়ে সব মানুষ এক রকম নয়। কারো যৌনশক্তি বেশি আবার কারো যৌনশক্তি কম। কিছু লোক এমন রয়েছে যারা একরাতে কয়েকবার সহবাস করেও দুর্বল হয় না। আবার কিছু লোক এমন আছে, যারা এক রাতে দুইবার সহবাস করলেই একেবারে দুর্বল হয়ে যায়। আবার অনেক পুরুষ এমন রয়েছে যে, পনের দিনের মধ্যে কিংবা মাসে মাত্র একবার সহবাস করে।

সহবাসের বিষয়টি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা লাগার মতো। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সময় যেমন খাওয়া বা পান করতে হয়, সহবাসের বিষয়টিও তেমন। সহবাসের আগ্রহ ও ইচ্ছা না জাগলে সহবাস অনুচিত। সহবাসের দ্বারা যদি শরীরে ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব হয় তবে এই সহবাস মধ্যমপন্থা অতিক্রম করেছে।

সকল মানুষকে তার সহবাসের শক্তি নিজে নিজে বুঝতে হবে। সাধারণত মোটা ও মজবুত লোকদের জন্য সপ্তাহে একবার সহবাস করা উচিত। অধিক সহবাস সকলের জন্যই ক্ষতিকর।

নিম্নোক্ত লোকদের অধিক সহবাস করা খুবই ক্ষতিকর-

১। যাদের শ্বাসকষ্ট রয়েছে, তাদের জন্য অধিক সহবাস খুবই ক্ষতিকর।

২। কাশির সাথে যাদের রক্ত আসে, তারা এ থেকে বিরত থাকবে।

৩। যাদের চোখের দৃষ্টি দুর্বল।

৪। যাদের পাকস্থলী ও যকৃৎ দুর্বল।

৫। যাদের সবসময় পেশাব ঝরতে থাকে।

অধিক সহবাসের ক্ষতি

মাত্রাতিরিক্ত কোনো জিনিসই ভালো না। আবে হায়াতও অধিক পান করা ভালো নয়, অন্যথায় এটা বিষ হয়ে যায়। অতিরিক্ত কেবল আল্লাহ ও তার রাসূল কর্তৃক বর্ণিত মহব্বতই প্রশংসাযোগ্য। সুতরাং সর্বক্ষেত্রেই মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা চাই। বিশেষ করে সুস্বাদু ও মজাদার বস্তু খাওয়ার মাঝে কখনোই অতিরিক্ত করা ঠিক নয়। অধিক সহবাসের কারণে গর্ভধারণের শক্তিও হারিয়ে ফেলার সম্ভবনা রয়েছে। কেননা অধিক সহবাসে পুরুষের বীর্য ও মহিলার ধাতু পাতলা হয়ে যায়। যুবক-যুবতীরা তাদের যৌবনকালে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ না করে দিওয়ানা হয়ে সহবাসের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে অমূল্য সম্পদ বীর্যকে নষ্ট করে ফেলে। তাদের খেয়ালই নেই যে, এক ফোটা বীর্য সত্তুর ফোটা রক্তের নির্যাস। এক ফোটা বীর্য উৎপাদন হতে সত্তর ফোটা রক্ত ব্যয় হয়। এই দামী জিনিসকে মাত্রাতিরিক্ত সহবাস করে নষ্ট করে দিচ্ছে। এক সময় তাদের অবস্থা এমন হয় যে, মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে থাকে। অবশেষে কোনোভাবে সহবাসের জন্য বিভিন্ন হেকিম-ডাক্তারদের স্মরণাপন্ন হয়ে ঔষধের মাধ্যমে সহবাস করতে হয়। অথচ নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সহবাস করলে আজ তাকে এসব জ্বালা সহ্য করতে হত না। হত না নিজেকে ধিক্কার দিতে।

অধিক সহবাসে স্ত্রীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়

অধিক সহবাসে যেভাবে পুরুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তদ্রুপভাবে নারীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুরুষের ন্যায় মহিলারাও দুর্বল হয়ে যায়, সুস্থ থাকে না। সুস্থ ও সবল সন্তান জন্ম দেয়ার শক্তি থাকে না। গর্ভবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা উচিত নয়। গর্ভের প্রথম মাসে অধিক সহবাস করার দ্বারা অনেক সময় দুর্বল

গর্ভ নষ্ট হয়ে যায়। অধিক সহবাসে বড় ধরনের রোগ-ব্যাধিও দেখা দেয়। যে সুস্থ ও সবল সন্তান কামনা করে, তাকে স্ত্রী গর্ভের প্রথম ও শেষ মাসে সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে। একমাস অতিক্রম না হলে স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে কিনা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তাই গর্ভের প্রথম মাসে সহবাস করবে না।

অধিক সহবাসের দ্বারা তারাই আরাম বোধ করে, যাদের শরীরে অধিক যৌনোত্তাপ রয়েছে, যাদের শরীরে রক্ত মাত্রাতিরিক্ত এবং মনীও বেশি।

গর্ভবতী মহিলাকে খুব সতর্ক হতে হবে

যখন কোনো মহিলা গর্ভবতী হবে, তখন তাকে খুব সতর্কতার সাথে চলতে হবে। নিজের পেটের বাচ্চাকে ভালো রাখতে গর্ভবর্তী স্ত্রীকে অনেক কিছু বর্জন করতে এবং অনেক কিছু গ্রহণ করতে হয়। যেমন–

- ❖ গর্ভবতী অবস্থায় ভারী কোনো বোঝা বা অন্যকিছু উঠাবে না।
- ❖ অধিক গরম কোনো কিছু খাবে না।
- ❖ বেশি ঠাণ্ডা কোনো কিছু যেমন আইস্ক্রিম কিংবা ফ্রিজের ঠাণ্ডা, বাসি খাবার খাবে না।
- ❖ অভিজ্ঞ ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী রোযা রাখবে না।
- ❖ যে সব খাবার হজম হতে অনেক সময় লাগে এমন খাবার খাবে না।
- ❖ দ্রুত হাঁটবে না, দৌঁড়ানো একেবারেই নিষিদ্ধ।
- ❖ উল্টা হয়ে শুবে না। কেননা গর্ভবতী অবস্থায় এভাবে শুলে অনেক সময় বাচ্চা পাগল বা মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে।
- ❖ অধিক ঘুমাবে না। কেননা এ সময়ে বেশি ঘুমালে সন্তান মোটা, বোবা ও অন্যান্য রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে।
- ❖ মাত্রাতিরিক্ত টক জিনিস খাবে না। কারণ এর দ্বারা সন্তান কোষ্ঠরোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে।
- ❖ মাত্রাতিরিক্ত লবণ খাবে না। এর দ্বারা মাথার রোগ হতে পারে।
- ❖ অধিক সহবাস করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ❖ অধিক নড়াচড়া থেকেও বেঁচে থাকতে হবে।
- ❖ চিন্তা করবে না, রাগ করবে না এবং পেরেশানও হবে না।
- ❖ বাথরুম ও টিউবলপাড়ে খুব সতর্কতায় যাতায়াত করবে। অনেকেই এসব স্থানে পিছলে পড়ে যায় এবং গর্ভের সন্তান মারা যায় কিংবা পড়ে যায়।

❖ কোনো ব্যক্তির চিৎকার ও মৃত্যুর দৃশ্য দেখবে না।

❖ কোনো ঝগড়া কিংবা মারামারিতে যাবে না।

❖ ভয়ানক ফটো দেখবে না।

❖ দূষীত আবহাওয়া থেকে বেঁচে থাকবে।

❖ পাতলা পায়খানা হওয়ার মতো কোনো কিছুই খাবে না। যদি এ রোগ হয়ে যায়, তাহলে বুঝে শুনে ঔষধ খাবে।

এ বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ, সবসময় তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলবে।

সহজে সন্তান ভুমিষ্টের পরীক্ষিত আমল

সন্তান ভুমিষ্ট হওয়া কত কঠিন ও কষ্টের বিষয়, তা কেবল যার সন্তান হয় সেই বুঝতে পারে। কি-যে অসহ্য যন্ত্রণা একমাত্র সে-ই অনুধাবন করতে পারে, কাউকে বলে বোঝানো অসম্ভব। সামান্য গুড়ে সুরা 'আম্মা এতাসাআলূন' ও সূরা 'ওয়াস্‌সামাই ওয়াত্ তারীক্ব' পড়ে দম করবে। এরপর গর্ভবর্তী মহিলাকে খাওয়ালে আধা ঘণ্টার মধ্যেই ইনশাআল্লাহ হালকা কষ্টেই সন্তান ভুমিষ্ট হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে লেখকের আমলের কিতাব **'পুশীদাহ খাযানে'** দেখা যেতে পারে।

সন্তান প্রসবে যে মহিলার খুব কষ্ট হয়

সন্তান প্রসবের সময় অসহ্য কষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে কিছু কিছু মহিলা রয়েছে, যারা কষ্ট সহ্য করতে অক্ষম। তারা নিম্নোক্ত ঔষধ পান করলে খুবই উপকৃত হবে। এটা পরীক্ষিত চিকিৎসা।

জাফরান ৪ মাশা। গুড়ের সাথে মিলিয়ে খাবে। সাথে সাথে গরম পানি বা গরম দুধ পান করবে। সম্ভব হলে ঔষধটি সেবনের সাথে সাথে মোরগের গোশতের ঝোল বা শুরবা পান করবে। এতে অতি সহজে ও তাড়াতাড়ি সন্তান প্রসব হবে।

সাময়িক সময়ের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতী গ্রহণ

অনেক সময় এমন হয় যে, স্বামীর যৌনচাহিদা অধিক বেশি। পক্ষান্তরে স্ত্রীর যৌনচাহিদা কম, শারীরিকভাবে অনেক দুর্বল, স্বাস্থ্যগতভাবে একেবারেই

ক্ষীণকায়, বয়স একেবারেই কম, কিংবা সন্তান নিলে তাকে বাঁচানো মুশকিল হবে। এ ভয়ও হয় যে, তার সাথে সহবাস করলে সে গর্ভবতী হয়ে যাবে কিংবা স্ত্রী মারা যেতে পারে। অথবা বর্তমানে তার দুধের বাচ্চা রয়েছে এ অবস্থায় সহবাস করলে সে গর্ভবতী হয়ে যাবে। যার ফলে তার বুকের দুধ নষ্ট হয়ে যাবে। বর্তমানে দুধের যে বাচ্চা রয়েছে, দুধের অভাবে তার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে। বাচ্চার মা গর্ভবতী হলে তার বুকের দুধ আর পান করার অবস্থা থাকবে না। অনেক সময় এ জাতীয় দুধ পানের দ্বারা বাচ্চা মারাও যায়। কিন্তু এসবের পরও স্বামী তার সাথে সহবাস করতে চায়। এ অবস্থায় স্বামী এমন পদ্ধতি গ্রহণ করবে, যেন স্ত্রী গর্ভবতী না হয় এবং যৌনচাহিদাও পুরণ হয়।

সহবাসের পরও গর্ভবতী না হওয়ার পদ্ধতি

যে সহবাসে সাধারণত স্ত্রী গর্ভবতী হয় না। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল।

১। সহবাসের সময় স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরবে না।

২। সহবাসের সময় যৌন উত্তেজক কোনো অঙ্গভঙ্গিমা দেখাবে না। যেন স্ত্রীর মনে স্বীয় বীর্যপাতের আগ্রহ না জাগে।

৩। উভয় রান উচু করে সহবাস করবে না।

৪। বীর্যপাতের সময় যথাসম্ভব পুরুষাঙ্গ বাহিরের দিকে রাখবে।

৫। উভয়ের বীর্যপাত যেন একসাথে না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবে।

৬। বীর্যপাতের সাথে সাথেই স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং স্ত্রীও দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর সাতবার কুর্দন করবে। হাচি দিবে যেন স্বামীর বীর্য বাহিরে বের হয়ে আসে। অথবা সহবাসের পরপরই স্ত্রী সাড়ে সাত তোলা তুলসি পাতার রস সেবন করবে। এতেও সন্তান গর্ভে আসবে না।

অভিজ্ঞ হেকিমদের মতে সহবাসের পূর্বে পুরুষাঙ্গে নিমের তেল ব্যবহার করে সহবাস করলে, স্ত্রী গর্ভবতী হবে না। তদ্রুপভাবে স্ত্রী যদি ঋতুস্রাবের পর চোখ বন্ধ করে আরগু গাছের একটি দানা খায়, তাহলেও সে গর্ভবতী হবে না।

বারবার গর্ভপাত হয়ে যাওয়া

অনেক মহিলার গর্ভে বাচ্চা আসার কিছুদিন পরই নষ্ট হয়ে যায় বা পড়ে যায়। অনেকবার এরূপ হওয়ার পরও বাচ্চা থাকছে না। আসলে এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। যেসব মেয়েদের গর্ভপাত জিন শয়তানের কারণে হয়ে

থাকে, সেসব মহিলারা না বুঝে বিভিন্ন চিকিৎসা গ্রহণ করে এমনকি ফকিরদের নিকট গিয়ে বিদআত, শিরকও গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু কোনো কিছুই কাজে আসে না। এসব মহিলাকে সব ধরণের চিকিৎসা বাদ দিয়ে জিন-শয়তান সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই তার গর্ভ বহাল থাকবে।

ভুল ধারণা

অনেক লোক এমন রয়েছে, যারা মহিলাদের বীর্যপাতের বিষয়টি বিশ্বাসই করে না। তাদের ধারণা মতে, মহিলাদের বীর্যপাত হয় না বা মহিলাদের বীর্য নেই। অথচ সত্য কথা হল, পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরও বীর্য রয়েছে। পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরও বীর্যপাত হয়। পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরও স্বপ্নদোষ হয়। বীর্যপাতের পর পুরুষরা যেমন দুর্বলতা ও ক্লান্তি অনুভব করে, ঠিক মহিলারাও দুর্বলতা ও ক্লান্তি অনুভব করে। কেননা, বীর্য সারা শরীর থেকেই আসে। চাই সে পুরুষ হোক বা মহিলা। পুরুষদের যেমন অণ্ডকোষ রয়েছে, মহিলাদেরও তেমন অণ্ডকোষ রয়েছে। মহিলাদের যদি বীর্য-ই না থাকত, তাহলে তাদের অণ্ডকোষ থাকার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এই বীর্যপাতের কারণেই একেক সময় সন্তান বাবার সুরত ধারণ করে আবার কোনো কোনো সন্তান মায়ের সুরত ধারণ করে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল কুরআন শরীফ। মহান রাব্বুল আলামীন যিনি বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টিকারী তিনি বলেন–

فلينظر الانسان مم خلق ، خلق من ماء دافق

يخرج من بين الصلب والترائب

'মানুষদের চিন্তা করার বিষয় যে, তাকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হল, তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে স্ববেগে নির্গত পানি থেকে। অর্থাৎ বীর্য থেকে, যা পুরুষের মেরুদণ্ডের হাড্ডি ও মহিলাদের বক্ষদেশ থেকে বের হয়।'

এজন্যই বলা হয়, যেমন বাপ তেমন বেটা। অর্থাৎ পিতার যেসব অঙ্গ দুর্বল ও কমজোর সন্তানেরও সেসব অঙ্গ দুর্বল ও কমজোর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কেননা বীর্যতো শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ থেকে নির্গত হয়।

স্বামী স্ত্রীর বীর্য দ্বারাই সন্তান ভূমিষ্ট হয়

অভিজ্ঞরা বলেন সহবাসের পর যে বীর্যপাত হয়, সে বীর্য কিছুক্ষণ জীবিত থাকে। বিশেষ করে পুরুষের বীর্য মহিলার জরায়ুতে বেশ সময় জীবিত

থাকে। এরপর স্বামীর বীর্য যখন স্ত্রীর জরায়ুতে প্রবেশ করে, তখনই সে বীর্য ধীরে ধীরে সন্তানের আকার ধারণ করে।

সুন্দর সন্তান জন্মের কৌশল

হেকিমগণ বলেন, কেউ যদি সুন্দর সন্তান কামনা করে, তাহলে তাকে সহবাসের সময় সুন্দর-সুশ্রী সন্তানের ফটো সামনে রাখতে হবে। বিশেষ করে বীর্যপাতের সময় অবশ্যই সে ফটোর দিকে গভীরভাবে নযর দিবে এবং মনে মনে ভাববে যে, এটা আমার সন্তান বিশেষ। এরূপ করার দ্বারা আশা করা যায়, সুন্দর ও সুশ্রী সন্তান জন্ম নিবে। এটা খুবই পরীক্ষিত আমল।

বি.দ্র. কোনো প্রাণীর ফটো তোলা, ফটো বানানো ও নিজের কাছে বা ঘর বাড়িতে রাখা জায়েয নেই। এ মাসআলার ব্যপারে উলামায়ে কেরামের স্মরণাপন্ন হবে যে, কেবল প্রাণীর চেহারা সামনে রাখা কতটুকু সহীহ?

সৎ সন্তান লাভের চমৎকার আমল

যদি কেউ তার সন্তানকে হেকিম, ডাক্তার, আলেম, জ্ঞানী ইত্যাদি বানাতে চায়, তাহলে গর্ভবতী স্ত্রীকে গর্ভকালীন অধিক সময়ই ঐ জাতীয় কিতাবাদী অধ্যয়ন করতে হবে। অর্থাৎ কেউ যদি তার সন্তানকে কুরআনের হাফেজ বানাতে চায়, তাহলে গর্ভকালীন বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে এবং যথাসম্ভব মুখস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। আর কেউ তার আগত সন্তানকে আলেম বানাতে চাইলে, গর্ভবর্তী স্ত্রীকে গর্ভকালীন সময়ে অধিকাংশ সময় দীনি কিতাবাদী পড়াতে হবে।

সন্তানকে আল্লাহর ওলী বানাতে চাইলে, গর্ভবর্তী স্ত্রীকে সব ধরনের হারাম কাজ ও হারাম মাল খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। বেশি বেশি কুরআনে কারীম তেলায়াত করবে। সব সময় অযু অবস্থায় থাকবে। সীরাতে রাসূল ও সাহাবা বেশি বেশি মুতালাআ করবে। বুযুর্গানে দীনের জীবনী ও তাদের তাকওয়া বিষয়ক পুস্তক মুতালাআ করবে। সব ধরণের পাপ-পঙ্কিলতা, ধোকাবাজী ও প্রতারণা থেকে দিলকে পাক সাফ রাখবে। সব কাজেই সুন্নাতের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করে চলবে। কোনো গর্ভবর্তী মহিলা এভাবে তার গর্ভকালীন সময় কাটালে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তার নবাগত সন্তানকে ওলীর গুণাগুণ দিয়ে ভূমিষ্ঠ করবেন।

নিজের নবাগত সন্তানকে বীর বাহাদুর ও সাহসী বানাতে ইচ্ছা থাকলে, গর্ভকালীন সময়ে স্ত্রীকে নবী রাসূল, সাহাবী ও বীর বাহাদুরদের বাহাদুরী বিষয়ক কিতাবাদী বেশি বেশি পড়তে হবে। এতে আপনার সন্তান একজন জানবায মুজাহিদ ও বীর বাহাদুর হবে।

আর যদি নিজে যেমন সন্তানও তেমন হউক এ কামনা থাকলে, গর্ভবতী স্ত্রী তার গর্ভকালীন সময়ে দৈনিক একাধিকবার শিশা ও আয়নায় নিজের চেহারা দেখবে।

ছেলে সন্তান কামনা

মহান রাব্বুল আলামীনের কুদরতে মায়ের গর্ভে সন্তান জন্ম নেয়। সে সন্তান ছেলে হবে বা মেয়ে হবে এটা কেবল আল্লাহ তাআলাই নির্ধারণ করেন। দুনিয়ার কেউ নিজের ইচ্ছায় ছেলে সন্তান কিংবা মেয়ে সন্তান জন্ম দেয়ার কোনো প্রকার শক্তি রাখে না।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'আমি যাকে ইচ্ছা করি ছেলে সন্তান দান করি। আমি যাকে ইচ্ছা করি মেয়ে সন্তান দান করি। আমি যাকে ইচ্ছা করি ছেলে-মেয়ে কোনোটাই দান করি না বরং তাকে বন্ধা বানিয়ে রাখি। এসবই আমার নিয়ন্ত্রণে। আমার ইচ্ছা ব্যতিত কিছুই হয় না। সবই আমার ইচ্ছাধিন।'

এসব জানার পরও দেখা যাচ্ছে একটি ছেলের জন্য পিতা মাতা, বিশেষ করে মা কেবল একটি ছেলে সন্তান পাওয়ার জন্য ঝাঁড়-ফুঁক, তা'বীজ-কবজ, দুআ কালাম কোনো কিছু করতে বাকি রাখে না। দুনিয়ার সব স্থানেই সে যেতে রাজি, তবুও তার থেকে ছেলে সন্তান হতে হবে। এসবের পেছনে দৌড়াদৌড়ি করে ছেলে সন্তান দানকারী মহান রাব্বুল আলামীনের কথাই ভুলে যায়। একবারের জন্য কায়মনোবাক্যে সবকিছুর সৃষ্টিকারী মহান স্রষ্টার নিকট দুআ করে না।

নিম্নে আমি কিছু পদ্ধতি বর্ণনা করছি, এসব পদ্ধতি অবলম্বন করার পাশাপাশি মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে কায়মনোবাক্যে ছেলে সন্তানের জন্য দআ করবে। বান্দা কেবল মাধ্যম গ্রহণ করতে পারে এবং চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু মাধ্যম ও চেষ্টায় সফল করা কেবল আল্লাহ তাআলার কাজ। তিনি বান্দার প্রতি দয়াবান হলেই কেবল এসব চেষ্টা তদবীর কাজে

লাগবে। এজন্য সবসময় আল্লাহকে ডাকতে হবে। তার সাহায্য কামনা করতে হবে। তবেই আশা করা যায় ছেলে সন্তানের মুখ দেখা যাবে। যাহোক নিম্নে ছেলে হওয়ার কৌশল লিখা হল–

১। ছেলে সন্তান জন্মের বিশেষ একটি আমল হল- পূর্ণাঙ্গ সহবাসের আগ্রহ জাগার পরই সহবাস করবে। সহবাসের পূর্ণাঙ্গ আগ্রহ জাগার পর সহবাস করার দ্বারা বেশিরভাগ ছেলে সন্তান জন্ম নেয় এটা বেশ পরীক্ষিত আমল। এটা করার সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে দুআ করতে থাকবে।

২। সহবাসের ক্ষেত্রে সহবাসের উত্তম সময়ের প্রতিও খেয়াল রাখবে। আর সেটা হল রাতের শেষ প্রহরে।

৩। মাসের বিশেষ একটি দিন বা সময় আছে, যে সময় মহিলারা সহবাসের প্রতি বেশ আগ্রহী থাকে। মহিলাদের জন্য সে সময়টি এমন যেমন প্রাণীদের সহবাসের জন্য বছরের বিশেষ কিছু দিন বা মাস। এজন্য মাসের কোন্ সময় মহিলাদের সহবাসের প্রতি বেশি আগ্রহ জাগে, সে সময়টি মহিলাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। এবং সে সময়েই স্বামীর সাথে সহবাস করবে।

কিছু কিছু মহিলার সহবাসের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখা দেয়, মাসিক বা ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া পরপরই। আর এর ধারাবাহিকতা এক সপ্তাহ পর্যন্ত বাকি থাকে। আবার কিছু মহিলার যৌনচাহিদা সারা মাসে একই রকম থাকে। এসব মহিলারা বেশি বেশি সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে। তাদের সাথে সহবাস করলেই পেটে সন্তান এসে যায়। আর যেসব মহিলাদের বিশেষ সময় ছাড়া সহবাসের প্রতি তেমন একটা আগ্রহ থাকে না। তাদের সাথে ঐ বিশেষ সময় বাদে অন্য সময় সহবাস করলে সাধারণত সন্তান জন্ম নেয় না। ঐ বিশেষ সময় বাদে অন্য সময়ে সহবাসের দ্বারা যেসব সন্তান জন্ম নেয়, অধিকাংশ সন্তান হয় মেয়ে। আবার এর উল্টাও হতে পারে।

৪। ঋতুস্রাবের দিন সহবাস করলে ছেলে সন্তান জন্ম নিবে। আর পরের দিন সহবাস করলে মেয়ে সন্তান জন্ম নিবে। তদ্রুপভাবে তৃতীয় দিন সহবাস করলে ছেলে হবে আর চতুর্থ দিন সহবাস করলে মেয়ে হবে। এভাবে জোড় বেজোড় অনুযায়ী সহবাস করলেই কাঙ্ক্ষিত ছেলে বা মেয়ে হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

কতিপয় হেকিম বলেন, স্বামী স্ত্রীর সহবাসের সময় যার বীর্য জরায়ুতে

প্রথমে পৌছবে, সন্তান তার মতোই হবে। অর্থাৎ স্ত্রীর বীর্য যদি জরায়ুতে প্রথমে প্রবেশ করে, তাহলে মেয়ে হবে। আর যদি স্বামীর বীর্য প্রথমে জরায়ুতে প্রবেশ করে, তাহলে ছেলে সন্তান জন্ম নিবে।

মেয়ে সন্তান জন্মের পদ্ধতি

এটাও সম্পূর্ণ আল্লাহর কুদরতাধীন। আল্লাহর উপর ভরসা করে কন্যা সন্তান জন্মের জন্য যেসব মাধ্যম বা অসিলা গ্রহণ করতে হবে। তা হল- ঋতুস্রাবের রক্ত বন্ধ হলেই বেশি বেশি সহবাস করা। সহবাসের প্রতি স্বামীর ইচ্ছা জাগলেই সহবাস করবে। এতে স্ত্রী নারায থাকলেও সহবাস করবে।

সহবাসে নীতিমালা থাকা আবশ্যক

একটি কথা স্মরণ রাখবে, দুনিয়ার কোন্ সফল কাজটি নিয়ম-নীতি ছাড়া হচ্ছে, দুনিয়ার সব সফল কাজই নিয়ম নীতিতে হচ্ছে। নিয়ম নীতি ছাড়া কোনো কাজ সফল হতে পারে না। সফল হলেও তাতে সাফল্যের তুলনায় ক্ষতির দিকটিই বেশি পাওয়া যাবে।

আমরা দৈনিক কতবার খাবার খাই। প্রতিদিন আমাদের কতবার খাবার খাওয়া উচিত। এসব বিষয় আমরা নিজেদের আয় রোজগারের উপর নির্ভর করে নির্ধারণ করি। মোটামুটি শক্তি সামর্থ থাকলে দিনে তিনবার খাবারের রুটিন করি। যদি কেউ ঐ রুটিনের বাইরেও একাধিকবার খায়, তাহলে দেখা যাবে, এ খাবার গ্রহণের দ্বারা যে আশা করেছিল তা না হয়ে বরং সে উল্টা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ঠিক তদ্রূপ সহবাসের বিষয়টিও একই। নিজের শরীরে যৌনশক্তি কতটুকু আছে, আমার দ্বারা প্রতি মাসে কতবার সহবাস করা দরকার। এসব ভেবে সহবাসের একটা নীতিমালা তৈরি করবে। শরীরকে সুস্থ ও সবল রেখে দিনে যে কয়বার বা সপ্তাহে যে কয়বার সহবাস করতে সক্ষম সে কয়বারের বেশি সহবাস করা বোকা লোকদের পরিচয়।

স্বামীর জন্য শিক্ষনীয় কথা

সকল স্বামীকে এ বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে, সহবাসের দ্বারা কেবল তারাই দুর্বল ও কমজোর হয়, তাদের তুলনায় মহিলারা খুব কমই দুর্বল ও কমজোর হয়। স্বামী ও স্ত্রীর ব্যাপারে আমি একটি উদাহরণ দিয়ে থাকি যে,

স্ত্রী হল বড় সড়কের ন্যায়, যার শেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। আর স্বামী হল সে রাস্তার পথিকের ন্যায়। পথিক কিছুক্ষণ চলার পরই দুর্বল হয়ে যায় কিন্তু রাস্তার কোনো দুর্বলতা নেই। রাস্তা কখনো দুর্বল হয় না। দুর্বল কেবল পথিকই হয়ে থাকে। একথাটি সর্বদা মাথায় রেখে স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে। কারণ তোমাকে এ রাস্তা পাড়ি দেয়ার জন্য আজীবন হাঁটতে হবে। এজন্য মধ্যমপন্থায় হাঁটতে হবে। যদি প্রথমেই দৌড় দাও, তাহলে এক সময় তোমার অবস্থা এমন হবে যে, তুমি নরমালভাবে হাঁটতেও পারবে না।

স্তন ও দুধ বিষয়ক কিছু কথা

মানুষ যখন যুবক হয় তখন তার বুকের ছাতীতে এক প্রকার শক্ত গোশতপিণ্ড দেখা দেয়। পুরুষদের শরীরে গরমের মাত্রা বেশি থাকায় সে গোশতপিণ্ডটি গলে যায়, কিন্তু মহিলাদের মাঝে গরমের তাপ কম হওয়ায় এবং ঋতুস্রাব অধিক হওয়ায় দিনদিন তা উপর দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে বাচ্চার খাবারের গুদামে পরিণত হয়।

শালদুধের গুরুত্ব

করুণাময় মহান রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বলে ঘোষণা করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করার পর তার লালন-পালনের সকল ব্যবস্থা তিনিই করেন। একটি নবজাতক শিশু জন্ম নেয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করে দেন। মায়ের বুকে নবজাত শিশুর দুধ সৃষ্টি করে রাখেন যা হালকা মিষ্টি ও উষ্ণ, যা নবজাত শিশুর নাজুক অবস্থার উপযোগী।

গর্ভ অবস্থার শেষ পর্যায়ে এবং প্রসবোত্তর ২-৪ দিন মায়ের স্তন হতে যে গাঢ় হলুদ রংয়ের দুধ আসে তাকে শালদুধ বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় 'কোলোস্টাম' বলে। এ দুধ পরিমাণে সামান্য হলেও নবজাতকের জন্য তা খুই গুরুত্বপূর্ণ। শালদুধ হলুদ বর্ণ ও অত্যন্ত গাঢ় হয়ে থাকে বলে অনেকেরই ধারণা শালদুধ বাচ্চার জন্য ক্ষতিকর। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে প্রমাণিত যে, এ দুধ শিশুর জন্য অত্যন্ত উপকারী। শালদুধ ফেলা বা নষ্ট করা কোনোক্রমেই উচিত নয়। শিশুকে শালদুধসহ বুকের দুধ পান করানো গুরুত্বপূর্ণ। জন্মের পর যত

তাড়াতাড়ি সম্ভব শিশুকে শালদুধ পান করানো উচিত।

বুকের দুধ খাওয়ালে মা ও শিশু উভয়েরই উপকার

শিশুর উপকার

❖ যে সকল শিশু বুকের দুধ পান করে, তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বুকের দুধ পান থেকে বঞ্চিত শিশুদের তুলনায় অধিক উন্নত হয়।

❖ শিশুর জন্য মায়ের বুকের দুধ আদর্শ সুষম ও নিরাপদ।

❖ মায়ের দুধে শিশুর ৬ মাস বয়স পর্যন্ত পরিপূর্ণ বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য সকল উপাদান সঠিক পরিমাণ থাকে। ফলে শিশু অপুষ্টিতে ভোগে না। যেমন, তা ডায়রিয়াসহ অন্যান্য রোগের ঝুঁকি কমায়।

❖ মায়ের দুধ সহজে হজম হয়।

❖ দুধ টেনে খেলে শিশুর চোয়াল, মাড়ি ও মুখমণ্ডলের গঠন সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়। শিশুর শরীরে বাড়তি মেদ জমে না। তাই শিশু প্রাণবন্ত থাকে।

মায়ের উপকার

❖ শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ালে মায়ের স্তন, জরায়ূ ও ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের ঝুঁকি কমে যায়।

❖ মা'র বাড়তি মেদ কমিয়ে শরীরের গঠন সুন্দর করতে সাহায্য করে। মা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ালে, মা ও শিশুর মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে মা সাফল্যমণ্ডিত হন। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-"মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে দুধ পান করাবে পূর্ণ দু-বছর"

বুকের দুধের উপকারিতা

❖ বুকের দুধ শিশুর জন্মগত অধিকার। এ অধিকার হতে শিশুকে বঞ্চিত করা যেমন গুনাহের কাজ তেমনি মানবাধিকার লংঘনের অপরাধ।

❖ মায়ের বুকের দুধ শিশুর জন্য আল্লাহ্‌ প্রদত্ত এক বিশেষ নিয়ামত। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার চাহিদা অনুযায়ী দুধের ঘণত্ব বা গুণ পরিবর্তন হয়।

❖ বুকের দুধ দিলে মায়ের দৈহিক সৌন্দর্য নষ্ট হয় এমন ভুল ধারণা অনেকেরই। অথচ সত্য কথা হচ্ছে যে, প্রতিদিন ও সঠিক নিয়মে বুকের দুধ

খাওয়ালে মা ও শিশু উভয়ের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বিকশিত হয় এবং মায়েদের স্তনের ও ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে।

❖ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মায়ের দুধপানকারী শিশুদের মানসিক বিকাশ তুলনামূলকভাবে ভালো হয় এবং তাদের আই কিউ কৃত্রিম দুধপানকারী শিশুদের চেয়ে ৮.৫ পয়েন্ট বেশি।

বুকের দুধ খাওয়ানোর পদ্ধতি

❖ শিশুকে সঠিক পদ্ধতি এবং ভঙ্গিতে দুধ খাওয়ানো একান্ত প্রয়োজন। এ সময় ভঙ্গি ঠিকমত না হলে মায়ের অসুবিধা ও অস্বস্তি হতে পারে।

❖ সেজন্য মায়ের উচিত দুধ খাওয়ানোর সময় আরামদায়কভাবে বসে নেয়া। ঘরে সোফা-কুশন না-ই থাকুক চৌকি বা কোনো ইজি চেয়ারে বসেও মা দুধ খাওয়াতে পারেন। খাওয়াতে পারেন কাত হয়ে শুয়েও। যে কোনো ভঙ্গিতে খাওয়ান না কেন, লক্ষ্য রাখতে হবে শিশুর ঘাড় যেন গুঁজে না থাকে। শিশুর দৃষ্টি থাকতে হবে মায়ের মুখের দিকে। শিশুকে পুরোপুরি ঘুরিয়ে নিতে হবে যেন স্তনের বোঁটার দিকে তার মুখ থাকে। মাথাটি থাকবে মায়ের হাতের ভাজের উপর। এর সঙ্গে প্রয়োজন মায়ের শরীরের ঘনিষ্ঠ ছোঁয়া।

❖ শিশুর শরীর ও মায়ের বুকের মাঝে ফাঁক না থাকে এবং শরীর যেন মায়ের বুকের সঙ্গে মিশে থাকে। খাওয়ার সময় ঘনিষ্ঠ ছোঁয়া পেতে থাকলে মা শিশু দু-জনেরই অত্যন্ত আরাম ও আনন্দ হয়। শিশু নিজেকে খুব নিরাপদ মনে করতে থাকে। এর ফলে তার সোমাটিক ডেভেলপমেন্ট খুব ভালো হয়।

❖ দুধ খাওয়ানোর সময় সিগারেট ধরার ভঙ্গি বা কাঁচি ধরার ভঙ্গিতে বোঁটা এবং বোঁটার চারপাশের বাদামী বা কালচে রঙের অংশ (এরিওলা)-কে টিপে ধরা উচিত নয়, তাতে দুধের উৎপত্তি ও নিজস্ব প্রবাহ ব্যাহত হয়।

❖ বুকের নিচে অন্য চারটি আঙ্গুল দিয়ে একটু ঠেলে তুলে বুড়ো আঙ্গুলটি এরিওলার অনেক দুরে চেপে ধরে পুরো স্তনটিকে সামান্য একটু তুলে দুধ খাওয়ানো ঠিক।

❖ প্রথমে শিশুর উপরের ঠোঁটে স্তনের বোঁটাটি দু-একবার লাগাতে হবে; তাতে শিশু বড় করে হা করবে। তখন শিশুর মুখে বোঁটা ভরে দিতে হবে। শিশুর নিচের ঠোঁট এরিওলাকে ঢেকে ফেলবে এবং উপরের ঠোঁট থাকবে এরিওলার শেষ প্রান্তে যাতে বোঁটাটি মুখের ভেতরে উপরের তালু স্পর্শ করে।

স্তনটি একটু তুলে না নিলে ভারের জন্য স্তনবৃন্তটি শিশুর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। তখন শিশু অস্বস্তিতে বোঁটা ছেড়ে দিতে চায়।

❖ শিশুর মাথা ও মুখটা শুধু বুকের দিকে টেনে আনা অনুচিত। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শিশুর পুরো শরীরটাই মায়ের দিকে এগিয়ে আসে। যে কোনো ভঙ্গিতেই খাওয়ানো হোক না কেন শিশুর মেরুদণ্ডটি যেন সোজা থাকে এবং স্তনটি মুখ থেকে এদিক ওদিক সরে না যায়।

❖ মায়ের উচিত শিশুকে প্রথমে এক স্তন থেকে পুরোপুরি দুধ খাওয়ানো। এতে দুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে না হলে অন্য স্তন থেকে একই সেশনে বা আসনে শিশুকে খাওয়াতে হবে।

❖ দুধ খাওয়াতে শুরু করার পর মায়ের দুধের প্রথমভাগে (যাকে বলা হয় ফোর মিল্ক) থাকে পানি এবং প্রোটিন (আমিষ), কিছুক্ষণ খাওয়ার পর দুধে আসে স্নেহ পদার্থ। এটি যেহেতু শিশুকে তৃপ্ত করে সবচেয়ে বেশি সেহেতু এটা না পাওয়া পর্যন্ত শিশু দুধ খেতে থাকে। এটি পেয়ে তৃপ্ত হলেই শিশু দুধ খাওয়া বন্ধ করে দেয়। অনেক সময় দেখা যায়, মায়ের দুধে এ স্নেহ পদার্থ আসতে অনেক সময় নেয় বলে অনেক্ষণ ধরে একই দিকে খেতে থাকে।

❖ সে ক্ষেত্রে একদিকে দুধ খাওয়া শেষ করার পর অন্যদিকে ফিরিয়ে তাকে দুধ খাওয়াতে চেষ্টা করতে হবে। তখন যদি সে না চায় তাহলে আর না খাওয়ানোই ভাল।

❖ তবে মনে রাখতে হবে, পরের বার খাওয়ানোর সময় আবার অন্য দিকের স্তন দিয়ে খাওয়ানো শুরু করতে হবে।

বুকের দুধ বাড়ানোর উপায়

❖ বুকের দুধ বাড়ানোর জন্য শিশুকে বারে বারে স্তন চুষাতে হবে। যত বেশি শিশু খাবে, তত দুধ আসবে। যাদের যমজ সন্তান হয়েছে, তারাও শুধুমাত্র বুকের দুধ দিয়ে প্রথম পাঁচ/ছয় মাস শিশুকে বড় করতে পারেন। মনে রাখতে হবে-শিশুর চাহিদা অনুযায়ীই দুধ আসে।

❖ মা এবং শিশুকে একই ঘরে একই বিছানায় এবং যতবেশী সম্ভব শিশুকে মায়ের কাছে রাখতে হবে। আর রাতের বেলা বেশি দুধ চুষাতে হবে।

❖ মাকে অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি করে খেতে হবে। এ সময় মাকে বেশি পরিমাণ শাক-সবজি, ফল, মাছ, গোশত খেতে হবে। এছাড়াও মা

প্রতিবার দুধ দেয়ার আগে ও পরে এক গ্লাস করে পানি খেলে, দুধ দানের জন্য পানির অংশ পূরণ হয়।

❖ পাঁচ/ছয় মাস বয়স পর্যন্ত বুকে দুধ ছাড়া শিশুকে অন্য কোনো খাবার না দেয়া এবং ফিডার, নিপল ইত্যাদি না দেয়া উচিত। বাচ্চা যদি নিপল চোষে, তবে বুকের দুধ চোষার আগ্রহ কমে যায় এবং দুধ কম আসে।

শিশু যথেষ্ট পরিমাণ দুধ পাচ্ছে কি না বোঝার উপায়

❖ শিশু যদি শুধু বুকের দুধ খেয়ে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টায় ছয়বারের বেশী প্রস্রাব করে, তবে বুঝতে হবে- সে যথেষ্ট দুধ পাচ্ছে।
যথেষ্ট দুধ পেলে শিশু কান্নাকাটি কম করবে, পরিতৃপ্ত দেখাবে এবং শিশুর ওজন বৃদ্ধি পাবে।

শিশুদের স্তন্যদানে করণীয় বিষয়

❖ সন্তান জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে সন্তানকে মায়ের নিকট আনতে হবে এবং মায়ের স্তনে মুখ লাগিয়ে দিতে হবে। মায়ের স্তনের শালদুধ শিশুর জন্য খুবই উপকারী।

❖ শিশুর জ্বর বা ডায়রিয়া হলে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা যাবে না।

❖ মায়ের জ্বর বা ডায়রিয়া হলে শিশুকে অবশ্যই বুকের দুধ দিতে হবে। বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা যাবে না। মা যদি মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হন কিংবা মারাত্মক কোনো রোগে আক্রান্ত হন, তবে সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা উচিৎ। এ সময় ভালো চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া জরুরি।

❖ শিশুর দুধ খাওয়া শেষ হলে শিশুকে ডান কাঁধে খাড়া করে শিশুর পিঠে হাত দিয়ে সামান্য চাপ দিতে হয়। ফলে দুধের সঙ্গে পেটে প্রবেশ করা বাতাস বের হয়ে আসবে।

❖ দুগ্ধদানরত মা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং স্তন পরিস্কার রাখবে।

❖ মা ও শিশু খাদ্য, স্বাস্থ্য ও অন্য যে কোনো বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিৎ।

বালক সাবালক হওয়ার লক্ষণ

যৌবনের আগমনে যুবকের কতগুলো পরিবর্তন আসে। যেমন- মুখমণ্ডলে দাড়ি ও গোফ উঠতে শুরু করে। বগলে এবং নাভীর নিচে, লিঙ্গের আশপাশে লোম বের হয়। কণ্ঠস্বর কিছুটা মোটা হয় এবং মাঝে মধ্যে স্বপ্নদোষ হয়। এটা ব্যতীত লিঙ্গের উত্তেজনার তারতম্যের ভিতর দিয়েও ঐ সময় বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্তন দেখা দেয়, লিঙ্গ উপরে নিচে উঠানামা করে এবং চরম মুহূর্তে শুক্রবাহী নালি দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে লিঙ্গের মুখের দিকে শুক্র বের হয়ে আসে। তখন লিঙ্গ খুব মোটা, লম্বা এবং শক্ত হয়। এ সময় যৌবনের তাড়নায় নারী সম্ভোগের বাসনা উগ্রভাবে জাগরিত হয়।

বালিকা সাবালিকা হওয়ার লক্ষণ

যুবতীদের যৌবন আগমনে নাভির নিচে যোনীর চতুর্দিকে সুক্ষ্ম, কুঞ্চিত লোম উদগমন হতে দেখা যায়। স্তনদ্বয় স্ফীত, সুগঠিত হয়ে কদম্ব ফুলের ন্যায় বুকের উপরে শোভা বর্ধন করে। ঐ সময় তাদের হাব-ভাব, চলা-ফেরা, চাহনি সবকিছুই মাদকতাময় মনে হতে থাকে। পুরুষের সান্নিধ্য লাভের বাসনায় তাদের দেহ-মন রোমাঞ্চিত হতে থাকে। তাদের সর্বাঙ্গে সৌন্দর্য্য পরিষ্ফুটিত হয়। চেহারায় লাবণ্যতা দেখা যায়। তাদের মনের গতি তখন বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমন কি প্রণয় বিষয়ক বইপত্র পড়া ও প্রেমপত্র লিখার ঝোক বেশী মাত্রায় দেখা যায়।

স্বামী-স্ত্রীর রতি শক্তির পার্থক্য

স্বামীদের (পুরুষেরা) কামোত্তেজনা অত্যাধিক প্রবল ও উগ্র প্রকৃতির হয়ে থাকে। পুরুষের জননেন্দ্রিয় (লিঙ্গ) অল্প কারণেই উত্তেজিত হয়ে উঠে। আবার অল্প সময় যৌন মিলনের পরেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে। বীর্য বের হবার সাথে সাথেই পুরষের উত্তেজনা ও সুখ-স্পৃহা শেষ হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সহবাসের আগ্রহ দমে যায়।

কিন্তু স্ত্রীলোকের কামোত্তেজনা অন্য ধরনের। স্ত্রীলোক অল্পতেই উত্তেজিত হয় না। তারা সামান্য স্পর্শ, চুম্বন, মর্দন বা আলিঙ্গনে উত্তেজিত হয় না। তাদের কামোত্তেজনা যেমন দেরীতে হয়, তেমন রতিকালও দীর্ঘায়িত হয়। যৌন শাস্ত্র মতে দেখা যায়, স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা তিন গুণ বেশী কামপ্রবণা

হয়। অতএব, এই ক্ষেত্রে অধিক সময় শৃঙ্গারের দ্বারা স্ত্রীলোকের মনের ইচ্ছেয় যৌনাঙ্গ উত্তেজিত ও সক্রিয় করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীলোকের মন চঞ্চল ও উত্তেজিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার যৌন অঙ্গগুলোও সক্রিয় হবে না।

স্ত্রীলোকেরা অল্পতে যেমন উত্তেজিত হয় না তেমন অল্প রতিক্রিয়ায়ও তৃপ্তি পায় না। সুতরাং স্ত্রীলোককে পুরুষরা আদর-সোহাগ ও নানা প্রকারের শৃঙ্গারের সাহায্যে তার যৌন বাসনা তীব্র ও চরম তৃপ্তি লাভের আশায় রতিক্রিয়ার জন্য সম্পূর্ণরূপে উত্তেজিত ও সক্রিয় করে তুলতে হবে। তা হলেই স্ত্রীলোক চরম সুখানুভব করে আনন্দ ভোগ করে রতিক্রিয়ায় তৃপ্তি লাভ করবে।

মানব দেহেরে উপাদান

মানব দেহে বহু রকমের উপাদান রয়েছে। যে উপাদানগুলো ছাড়া মানবদেহ গঠিত বা সৃষ্টি হতে পারে না। যে সকল উপাদানে মানবদেহ সৃষ্টি বা গঠিত হয় তাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- কঠিন অংশ, কোমল অংশ এবং তরল অংশ। নিম্নে তার ব্যাখ্যা দেয়া হল–

১। হাড়, দাঁত, নখ ইত্যাদি কঠিন অংশ।

২। শিরা, মগজ, চর্বি, পেশী (মাংশ) ইত্যাদি কোমল অংশ।

৩। রক্ত, রস, থুথু, বীর্য ইত্যাদি তরল অংশ।

মানুষের জীবন পাঁচ স্তরে বিভক্ত

মানুষের জীবনকে বৈজ্ঞানিকেরা পাঁচটি স্তরে ভাগ করে দেখিয়েছেন। যথা– ১। শৈশব, ২। কৈশোর, ৩। যৌবন, ৪। পৌঢ় ও ৫। বার্দ্ধক্য।

পুরুষের জননতন্ত্র

জীব জগতের জন্ম রহস্যকে সৃষ্টির এক বিচিত্র সৃষ্টি বলে যদি স্বীকার করে নেয়া হয়, তবে তার মূলে রয়েছে শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের দান। সেই অঙ্গগুলোর রহস্যও সকলের জেনে রাখা কর্তব্য। এখন প্রথমে পুরুষ ও স্ত্রী জননতন্ত্র সর্ম্পকে ভাল জ্ঞান রাখা সকলের জন্যই প্রয়োজন।

কতগুলো অঙ্গের সহযোগিতা ও সমন্বয়কে পুরুষ জননতন্ত্র বলা হয়। তন্মধ্যে পুরুষাঙ্গ বিশেষ প্রধান অঙ্গ। অন্যান্য অঙ্গ রতিক্রিয়ার সাহায্যকারী। পুরুষ জননতন্ত্র ও সাহায্যকারী অঙ্গগুলোর রূপ কেমন তা উল্লেখ করা হচ্ছে-

প্রথমত পুরুষ জননতন্ত্রকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। তার একটি হল বাহ্যিক এবং অন্যটি হল আভ্যন্তরীন।

পুরুষ জননতন্ত্রের বাহ্যিক অঙ্গগুলো হচ্ছে-

১। পুরুষাঙ্গ ২। লিঙ্গমনি ৩। অগ্রচ্ছদা
৪। মূত্রনালী ৫। অণ্ডকোষ বা শুক্রাশয়।

এখানে পুরুষ জননতন্ত্রের বাহ্যিক অঙ্গ ও আভ্যন্তরীন অঙ্গগুলোর বিশেষ বিশেষ অঙ্গ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

পুরুষাঙ্গ

বাহ্যিক দিক হতে দেখলে আপাতত পুরুষাঙ্গ এবং অণ্ডকোষ বা শুক্রাশয় দুটির কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাধারণত দেখা যায়, সকল পুরুষের পুরুষাঙ্গের দৈর্ঘ্যের মাপ এক রকম হয় না। স্বাভাবিক অবস্থায় পুরুষের লিঙ্গের দৈর্ঘ্য সোয়া তিন ইঞ্চি হতে চার ইঞ্চির মাঝামাঝি দেখা যায়। উত্তেজনার সময় তা সোয়া পাঁচ হতে ছয় ইঞ্চির কিছু বেশি লম্বা হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে লিঙ্গের দৈর্ঘ্য তার চেয়ে কম ও বেশি হতে পারে।

তার চেয়ে সামান্য ছোট বড় হলে তাতে কিছুই আসে যায় না এবং সহবাসে কোনো রকম অসুবিধা হয় না। পুরুষাঙ্গ অস্বাভাবিক ছোট বা বড় হলে সঙ্গমকালে স্ত্রীলোকের জন্য অসুবিধার কারণ হতে পারে।

কারো ধারণা, পুরুষাঙ্গ লম্বায় খুব বড় হলে স্ত্রী সহবাসে বেশী আনন্দ উপভোগ করা যায়। আসলে এরূপ ধারণা করা নিতান্তই বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। লিঙ্গের দৈর্ঘ্য নিয়ে বাহাদুরী করা আহাম্মকি ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার লিঙ্গের খর্বতা নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করা হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। মোদ্দা কথা হল যে, স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সহবাসের সময় ঘর্ষণেই আনন্দ লাভ করে থাকে।

লিঙ্গমনি ও অগ্রচ্ছদা

লিঙ্গের মাথায় অংশটুকুকে লিঙ্গমনি বলা হয়। লিঙ্গের অন্যান্য অংশের চেয়ে এই অংশটা অপেক্ষাকৃত পুরু, চওড়া এবং বেশী সংবেদনশীল। যে চামড়াটুকু দিয়ে এই লিঙ্গমনি আবৃত (ঢাকা) থাকে, তাকে অগ্রচ্ছদা বলা হয়। লিঙ্গের উত্তেজিত অবস্থায় লিঙ্গমনিকে ঢেকে রাখা এবং চামড়া (অগ্রচ্ছদা)

সাধারণত সরে গিয়ে উপরে উঠে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে যেই ছেলেদের 'মুদা' বা ফাইমোসিস থাকে, তাদের অগ্রচ্ছদা খুব ছোট এজন্য চামড়াটা সরে যেতে পারে না এবং লিঙ্গমনি বের হতে পারে না। এই অবস্থায় চামড়াটুকু কেটে ফেললেই ভবিষ্যতের জন্য খুবই উপকার। কারণ, যাদের লিঙ্গমনি সবসময় ঐ চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে তাদের সংবেদনশীলতা কমতে পারে না। সুতরাং রতিক্রিয়ার সময় শুক্র ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। এছাড়া আরও বিপদও হতে পারে। যেমন- লিঙ্গমনি অগ্রচ্ছদা দ্বারা আবৃত থাকলে তার ভিতরে অল্প করে ময়লা জমতে থাকে এবং তা নিয়মিত পরিস্কার না করলে বিভিন্ন রোগ জন্ম নেয়। ফলে তাদের যৌন স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায় এবং পীড়িত হয়ে পড়ে।

সুতরাং- পিতা-মাতার খেয়াল রাখতে হবে যে, তাদের ভুলের জন্য ছোট বেলায়ই তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ রুগ্ন হয়ে না যায়। অতএব ছোট বেলাই ছেলেদের লিঙ্গমনি ঢেকে রাখা ঐ চামড়াটুকু কেটে ফেললেই তারা ভবিষ্যৎ জীবনে উন্নত যৌন স্বাস্থ্যের অধিকারী হবে এবং তাদের ঔরসে সু-স্বাস্থ্য সম্পন্ন সন্তান জন্ম নিবে এবং স্রষ্টার সৃষ্টির ধারা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ইসলামী শরীয়াতে এভাবে লিঙ্গমনি ঢেকে রাখা চামড়াটুকু কেটে ফেলা সুন্নত। একে সাধারণত মুসলমানী বা খৎনা বলা হয়।

মুত্রনালী

লিঙ্গের ভিতর দিয়ে মুত্রাশয় হতে যে চিকন ও সরু নালিটি লিঙ্গের মুখ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে তাকেই মুত্রনালি বলা হয়। মুত্রাশয়ে জমে থাকা মুত্র (পেশাব) ঐ মুত্রনালী দিয়েই দেহ হতে বের হয়ে যায়।

শুক্রাশয়

পুরুষাঙ্গ ব্যতীত অন্য একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হচ্ছে শুক্রাশয়দ্বয়। একে অণ্ডকোষ বা বীর্যধারও বলা হয়। সাধারণত একটি সুস্থ মানুষের শুক্রাশয় দুটি মুরগীর ডিমের ন্যায় বড় হবার কথা। কিন্তু এর চেয়ে ছোটও হতে পারে। তাতে কোনো অসুবিধা হয় না। তাদের ভিতরে বাম পাশেরটা ডান পাশেরটা অপেক্ষা ঈষৎ বড় হয়ে থাকে এবং নীচের দিকে ঝুলানো অবস্থায় থাকে।

এ শুক্রাশয় দুটি যে চামড়ার থলির ভিতরে ভরা থাকে, তাকে ইংরেজিতে 'স্কোটাম' বলা হয়। ঐ স্কোটামের ভিতরে আবার পৃথক পৃথক দুটি বিভাগ

আছে। তার প্রতিটি বিভাগের একটি করে শুক্রাশয় বা অণ্ডকোষ থাকে। ঐ শুক্রাশয় দুটির ভিতরে অনবরত শুক্র জীবানু তৈরী হয়ে চলছে।

শুক্র জীবানুর পরিচয়

রতি ক্রিয়ার সময়ে কামোত্তেজনা যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে, তখন লিঙ্গের ভিতর হতে সেই ঘোলাটে সাদা আঠায়ুক্ত এক প্রকার উষ্ণ তরল পদার্থ দ্রুতবেগে বের হয়ে আসে, তাকেই বলা হয়ে থাকে বীর্য বা শুক্র। এই পদার্থ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তার ভিতরে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জীবানু রয়েছে। তাকেই বলা হয়ে থাকে শুক্র জীবানু। স্ত্রী সহবাসের সময় পুরুষের লিঙ্গমুখ দিয়ে বীর্য বের হয়ে স্ত্রী গর্ভাশয়ের ভিতরে প্রবেশ করে এবং গর্ভাশয়ে ঐ শুক্র জীবানুর দ্বারা ভ্রুণের জন্ম হয়ে থাকে। ভ্রুণের উৎপত্তি হবার অর্থ হল, স্ত্রীলোক গর্ভবতী হওয়া।

শুক্র জীবানু সঞ্চার নালী

শুক্রাশয়কে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায়, তার ভিতরে এক প্রকার অতি সরু সরু নালী বিদ্যমান, যার নাম হল, শুক্র জীবানু সঞ্চার নালী। নালীগুলোর ভিতরে এক প্রকার বড় বড় কোষ থাকে। এ গুলোকে বলা হয় প্রধান শুক্র জীবানু। যৌবনের শুরু হতে ঐ কোষগুলো সর্বদা দুভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে। এ কারণে সর্বদা জীবানু তৈরী হয়ে চলেছে।

এই শুক্র জীবানুগুলোর আকার অতি ক্ষুদ্র। সেটা লম্বায় এক ইঞ্চি চার শ ভাগের এক ভাগ হতেও কম। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বীর্যের মধ্যে বিশ হতে পঁচিশ কোটি শুক্র জীবানু থাকে বলে জানা যায়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যম ছাড়া তাকে মানুষের চোখ দ্বারা দেখতে পাওয়া যায় না। অন্ততঃ ঐ যন্ত্রের সাহায্যে এক হাজার গুণ বড় করে দেখলে, তা হলেই তাকে চর্ম চোখ দ্বারা দেখা সম্ভব। ঐ শুক্র জীবানুগুলোর আকৃতিও এক প্রকার অদ্ভুত ধরনের। তার মাথা কিছুটা লিঙ্গমুণ্ডের আকৃতির মতো। তার নীচে একটা লম্বা লেজ আছে। ঐ লেজ নাড়িয়ে নাড়িয়ে শুক্র জীবানুসমূহ শুক্রাশয় হতে বের হয়ে পুরুষের জননতন্ত্রের মধ্যে হতে অগ্রসর হয়। শুক্র জীবানুগুলোর আকৃতি যে কি প্রকার ক্ষুদ্র, তার একটু অনুমান দিচ্ছিঃ

যৌন বিজ্ঞানীদের মতে, একজন পুরুষের একবার যতটুকু শুক্র নির্গত হয়, তার ভিতরে এত অধিক সংখ্যক শুক্র জীবানু মৌজুদ থাকে যে, দুনিয়ার পনের হতে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের যতগুলো স্ত্রীলোক আছে, তাদের সকলেরই তা দ্বারা গর্ভবতী হওয়ার সম্ভব।

পুরুষের জননতন্ত্রের ভিতরের পথটা কি প্রকার তা এখানে কিছুটা আলোচনা করছি। ইতিপূর্বে শুক্র জীবানু সহায়ক নালীগুলোর যে নাম উল্লেখ করেছি ঐ গুলো অপেক্ষাকৃত বড় অন্য একটি নালীর ভিতর গিয়ে পড়েছে, তার নাম হল এপিডিডাইমিস। এই এপিডিডাইমিস পুন: তার চেয়ে বড় একটি নালিতে গিয়ে প্রবেশ করেছে, তার নাম হচ্ছে 'ভাস ডেফানস'। যেই সকল শুক্র জীবানু শুক্রাশয়ের ভিতরে জন্ম হচ্ছে সেগুলো ক্রমান্বয়ে এই 'ভাসডেফারেনসের ভিতরে এসে পড়েছে। পুন: এখান হতে ঐ গুলো একটি ক্ষুদ্র থলির ভিতরে গিয়ে জমা হচ্ছে, তাকে বলা হয় 'শুক্রকোষ'।

এপিউডাইমিস এবং ভাসডেফারেসনের গা হতে এক প্রকার তরল পদার্থ নির্গত হয়। এই তরল পদার্থ শুক্র জীবানুর সাথে মিশে যায়। অন্য দিকে শুক্র কোষ হতেও আর এক প্রকার তরল পদার্থ এসে তার সাথে মিশে যায়। তার কারণেই শুক্রের রঙটা ঐ প্রকার ঘোলাটে, সাদা এবং আঠালো হয়।

প্রসটেট গ্রন্থি

শুক্রকোষের মুখের কাছে 'প্রসটেট' নামক গ্রন্থি হতে এক প্রকার তরল পদার্থ বের হয়ে আসে। অদ্ভুত ধরণের তার গন্ধ। ঠিক বীর্যের গন্ধের মতোই। কামোত্তেজনার চরম অবস্থায় জননতন্ত্রের গাত্রের পেশীগুলো তখন অতি দ্রুত সংকুচিত হয়। এই প্রকার সংকুচিত হওয়ার কারণে তখন জননতন্ত্রের নালীগুলোও শুক্রকোষের উপর চাপ দিতে থাকে। ঐ চাপের কারণে ভিতরের বীর্য ধাক্কা খেতে খেতে সম্মুখের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। সমানতালে পেশীগুলো সংকুচিত হয় বলে নালীগুলোর উপরেও তালে তালে চাপ পড়তে থাকে। এই জন্যই শুক্রকোষের ভিতরে যে শুক্রটুকু জমা থাকে, তা একবারে বের না হয়ে তালে তালে লিঙ্গের মুখ দিয়ে দ্রুতগতিতে বের হয়ে পড়ে। যে সময় শুক্রকোষ হতে শুক্র বের হয়ে মূত্রনালীর ভিতরে আসে তখন প্রসটেট গ্রন্থির অদ্ভুত তরল রসটুকু বের হয়ে শুক্রের সাথে মিশে যায়। ঐ রসটুকু অধিক উত্তেজক ও আনন্দদায়ক। সুতরাং যখন শুক্র জীবানুগুলো রসের সাথে

মিলিত হয় তখন তা অত্যাধিক চঞ্চল হয়ে পড়ে। ঐ প্রকারেই বীর্য মূত্রনালী দিয়ে এগিয়ে এসে লিঙ্গ মুখ দিয়ে বের হয়ে স্ত্রী যোনী নালীতে পড়ে।

কাউপার গ্রন্থি

কাউপার গ্রন্থির অবস্থান হচ্ছে প্রসটেট গ্রন্থির নিচে। পুংলিঙ্গের মূলদেশস্থ নালীর দুই পাশে দুটি শক্ত গাটের মত বস্তু আছে। তাকেই কাউপার গ্রন্থি বলা হয়। ঐ দুটি গ্রন্থি হতে উত্তেজনার সময় এক প্রকার রস বের হয়। ঐ রসের কারণে লিঙ্গ নালী পিচ্ছিল হয়ে যায়। অবশ্য ইসলামী পরিভাষায় একে মজী বলে, এখানে উল্লেখ্য যে, সপ্তদশ শতকে জনৈক যৌন বিজ্ঞানী এই গ্রন্থি আবিস্কার করেছেন।

বস্তী প্রদেশ

পুরুষের নাভীর নিচে উরুদ্বয়ের মাঝখানে লিঙ্গ এবং অণ্ডকোষ যেখানে মিলিত হয়েছে, তাকেই বলা হয় বস্তী প্রদেশ। একটু খেয়াল করলেই বুঝা যাবে যে, ঐ জায়গাটা ত্রিকোণ বিশিষ্ট। যৌবনকালের শুরুতে তার নীচ হতে লোম উঠতে শুরু করে। এই লোম লিঙ্গের আশপাশে অণ্ডকোষের চতুর্দিকে মলদ্বার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে। তার নাম 'যৌনকেশ'। যৌবনের শুরু হতে বার্ধক্যের শেষ পর্যন্ত একইভাবে তা বিদ্যমান থাকে।

শুক্র বা বীর্যের উৎপত্তি

মানব দেহের সার পদার্থ হল শুক্র বা বীর্য। দেহের রক্তের সার দিয়ে এই শুক্র বা বীর্য তৈরী হয়ে থাকে। শরীরের সব জায়গায় এই রস ছড়িয়ে থাকে। যৌবনের রতিক্রিয়ার বাসনা হলে এই পদার্থ স্নায়ুমণ্ডলীকে চঞ্চল করে তোলে এবং সমস্ত শরীর হতে শুক্রবাহীস্নায়ুর সহায়তায় এই সংগৃহীত হয়ে ঘণীভূত হয়। রতিক্রিয়ার সময় স্নায়ুমণ্ডলীতে সুখ অনুভব হওয়ার এই ঘনীভূত শুক্র পিঙ্গলা দ্বারা বায়ুর সহায়তার মূলধারে এসে জমা হয়। পুন:মূলধারা হতে অধোবায়ুর সাহায্যে নিম্নের দিকে শুক্রাশয় দিয়ে লিঙ্গ মুখে এসে পড়ে। সহবাসের সময় পুরুষের শ্বাস-প্রশ্বাস অতি দ্রুত হয়ে থাকে। যার ফলে শুক্র দ্রুতগতিতে নেমে আসে। অধোবায়ূর সহায়তা বাদে শুক্র নির্গত হতে পারে না। একজন সুস্থ মানুষের দেহ হতে একবার যতটুকু শুক্র বের হয়, তার

ওজন আনুমানিক এক ডাম হতে দুই ডাম। তবে শুক্রের ওজন এটা হতে কম বা বেশিও হতে পারে। আবার যদি কোনো পুরুষ একাধিকবার রতিক্রিয়া করে, তখন হয়ত শেষবারে শুক্রপাত নাও হতে পারে।

যৌন বিজ্ঞানীদের মতে, বীর্য হল মানুষের খাদ্য সামগ্রীর সারাংশ। আটটি বস্তুর মাধ্যমে এর উৎপত্তি হয়ে থাকে। যেমন- ১। খাদ্য ২। রস ৩। রক্ত ৪। অস্থি ৫। গোশত ৬। মজ্জা ৭। মেদ ৮। শুক্র।

লিঙ্গের গঠন প্রণালী

মানুষের লিঙ্গ কতিপয় শিরা, উপশিরা, তন্তু ও স্নায়ুর সাহায্যে গঠিত হয়েছে। এর ভিতরে কোন অস্থি বা পেশী নেই। কিছুটা স্পঞ্জের মত। এটা কখনো নিস্তেজ হয়ে ছোট হয়ে যায়, আবার উত্তেজনার সময়ে বেড়ে যায়। লিঙ্গ গঠনের ভিতরে একটু চিন্তা করলে অনুভব করা যাবে যে, স্রষ্টার কুদরতের মহিমা কত বড়। তাঁর কুদরতের কোন সীমা নাই।

লিঙ্গের অভ্যন্তরে কতগুলো ছিদ্র ছিদ্র আছে। কামোত্তেজনার সময় ঐ ছিদ্রগুলো রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। যার ফলে লিঙ্গ সতেজ ও শক্ত হয়ে থাকে। কামোত্তেজনার পরে কিন্তু এ জমা রক্ত ছিদ্রগুলো হতে বের হয়ে যায়। তখন লিঙ্গ আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে যায়। কামোত্তেজনা ব্যতীতও লিঙ্গ প্রসারিত হয়। যেমন পেশাবের বেগ হলে লিঙ্গ প্রসারিত হয়ে থাকে।

আমরা স্বাভাবিকভাবে লিঙ্গকে লম্বায় যতখানি দেখি, আসলে তা তার লম্বার মাপ নয়। আমাদের দৃষ্টির বাইরে ও ভিতরের দিকে তার কতক অংশ আছে। যেমন উত্তেজনার সময় বস্তী প্রদেশে হাত দিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে যে, লিঙ্গের মত শক্ত ও মোটা কিছু অংশ ভিতর, দিকেও আছে।

লিঙ্গের কাজ কি

সৃষ্টি জগতে মানব জাতি তথা পুরুষ ও স্ত্রীলোক সঙ্গম করে থাকে এবং তার ফলেই সন্তান লাভ হয়। মানব দেহের ভিতরে যে অসার জলীয় পদার্থ আছে, তা এই লিঙ্গের মাধ্যমে মূত্রের আকারে বের হয়ে যায়। সুতরাং এই অঙ্গ সক্রিয় না থাকলে মানুষের পক্ষে দেহ ধারণ করা এক রকম অসম্ভব হয়ে পড়বে বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

মানুষের দেহে সঙ্গম ক্ষমতা বিশিষ্ট অঙ্গ আর নেই। এর গঠন প্রণালী অন্যান্য অঙ্গগুলো হতে সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির। পুরুষের মনে রতি বাসনার উদ্রেক হলেই তা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার উত্তেজনা দমবে না এবং লিঙ্গও নিস্তেজ হবে না। আসলে রতিক্রিয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনা আপনি নিস্তেজ হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়।

সুতরাং শরীরের ভিতরে যেমন এই অঙ্গটা একটা বিশেষ ক্ষমতা দখল করে রয়েছে, তেমনি শরীরের সর্ব প্রকারের যৌন সুখানুভূতির প্রাণকেন্দ্রও হচ্ছে এই অঙ্গটা। সঙ্গমকালে পুরুষ ও স্ত্রীকে চরম ও পরম আনন্দ ও সুখ দান করে তার এই অঙ্গ বা লিঙ্গটা।

অতএব, চিন্তা করলে অবাক লাগে যে, কিভাবে একই নালি পথে শুক্র ও মূত্র বের হয়ে থাকে। এটা মানুষের চিন্তার বাহিরে। এটাই হচ্ছে সৃষ্টির স্রষ্টার কুদরতের নিদর্শন। পুরুষ বা স্ত্রীর রতিক্রিয়ার সময়ে মূত্রের বেগ থাকলেও তখন মূত্র বের হয় না। আবার শুক্র বের হওয়ার সময়ও মূত্র বের হতে দেখা যায় না বা বের হয় না।

উত্তেজনা কিভাবে হয়

রতিক্রিয়ার প্রারম্ভিক অবস্থাকেই বলা হয়ে থাকে উত্তেজনাকাল। ঐ সময় লিঙ্গটা কঠিন ও মোটা হয়ে যায়। তখন একটা অভূতপূর্ব শিহরণ লিঙ্গের মধ্য দিয়ে স্রোতের মত বয়ে যেতে থাকে এবং চঞ্চল হয়ে পড়ে দেহ ও মন।

এই উত্তেজনা নানা প্রকারেই হতে পারে। কোনো প্রাণীকে রতিক্রিয়া করতে দেখলে. যৌনাঙ্গসমূহ স্পর্শ বা মর্দন করলে অথবা কোন ষোড়শী যুবতীর কামকেন্দ্রগুলো দেখলে কিংবা আকার ও প্রকৃতি মনে মনে চিন্তা ভাবনা করলে। যৌন সর্ম্পকীয় কথোপকথন করলে বা বই পত্র পড়লে ইত্যাদি কারণে পুরুষাঙ্গ উত্তেজিত হয়ে থাকে।

এই উত্তেজনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে, শরীয়ত সম্মত বৈধ স্ত্রীর জননতন্ত্রের ভিতরে ঐ লিঙ্গ প্রবেশ করিয়ে কাম-বাসনার তৃপ্তি লাভ করা। অনেকে বৈধ রাস্তা ছেড়ে অন্যভাবেও ঐ কাজটা করে থাকে, যেমন- হস্ত মৈথুন, পুং- মৈথুন বা পশু মৈথুনের মাধ্যমে যৌন ক্ষুধা মিটিয়ে থাকে। অবশ্য এটা নিষেধ রয়েছে এবং তা পাপ কার্য।

মসুলমানের পক্ষে এমন করা মহা অন্যায়। ডাক্তারী মতে- স্বাস্থ্যের পক্ষে গর্হিত কাজ। যাদের এমন কু-অভ্যাস; তাদের স্বাস্থ্য অচিরেই ভেঙ্গে পড়ে।

এখানে আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল যে, পুংলিঙ্গটি কামরসের প্রাচুর্য্যে মোটা ও লম্বা হয়ে এক অনাকাঙ্ক্ষিত পুলকে শিহরিত হয়ে উঠে। তখনই তার স্ত্রী যোনী নালীতে প্রবেশের ক্ষমতা ধারণ করে। কেননা তুলতুলে নরম লিঙ্গ স্ত্রী যৌনাঙ্গে প্রবেশের ক্ষমতা রাখে না। এ জন্যই উত্তেজনা আবশ্যক। তা কি প্রকারে হতে পারে তা উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

সহবাসের সময় পুরুষের লিঙ্গ যেমন উত্তেজিত হওয়া আবশ্যক তেমনি স্ত্রীর যৌনাঙ্গেরও কামরসে পূর্ণ হয়ে যৌনিপথ পিচ্ছিল হওয়া দরকার। নতুবা পুং লিঙ্গের ঘর্ষণে স্ত্রীর যোনীর ভিতরে যখম হতে পারে এবং ঐ অবস্থায় পুরুষের জন্য সহবাস করা কষ্ট সাধ্য হবে।

সুতরাং রতিক্রিয়ার সময় পুরুষের লিঙ্গটা যেভাবে উত্তেজিত হয়ে থাকে, ঐ ভাবে স্ত্রীর যোনীনালীও কামোত্তজনায় এক প্রকার রসে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে যায়। তখন পুরুষাঙ্গ খুব সহজেই স্ত্রীর যোনীতে প্রবেশ করিয়ে জরায়ু মুখ পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। এই প্রকারেই রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে থাকে। কামোত্তজনায় যখন ধীরে ধীরে আকাঙ্ক্ষা চরম পর্যায় পৌঁছাতে থাকে, তখন পুরুষাঙ্গটা দ্রুত ঘনঘন স্ত্রীর যোনীর মধ্যে উপর নীচে নাড়াচাড়ার কারণে পুরুষের ইচ্ছে শক্তির তারতম্য ভেদে কিছু সময় রতিক্রিয়া স্থায়ী হয়ে শুক্রপাত হয়ে থাকে। শুক্রপাতের পরক্ষণেই পুরুষাঙ্গটা ক্রমান্বয়ে ছোট ও নরম হয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়।

পুরুষাঙ্গ বিষয়ে কিছু কথা

آلہ تناسل তথা পুরুষাঙ্গ– এর পরিচিতি বিভিন্ন নামেও রয়েছে। যেমন–

عضو مخصوص، قضیب، ذکر، عضو تناسل، آلہ مردی

তবে আমরা پوشیدہ راز কিতাবে পুরুষাঙ্গের জন্য آلہ تناسل শব্দটি ব্যবহার করেছি। যার অর্থ– যে যন্ত্রের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা যায়। বাংলা ভাষায় একে পুরুষাঙ্গ বলে।

মানুষের শরীরে যতগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, তন্মধ্যে এটিও একটি অঙ্গ। পুরুষেরা প্রাপ্তবয়সে পৌঁছার পর তাদের পুরুষাঙ্গে এক প্রকার শক্তি আসে। যার কারণে বিশেষ মুহূর্তে তা শক্ত ও মজবুত হয়। যখন শক্ত ও মজবুত হয়, তখন তা পূর্বের তুলনায় অনেকটা দীর্ঘ হয়ে যায়। সহবাসের

সময় পুরুষাঙ্গ দীর্ঘ হওয়ার ফায়েদা হল, এর দ্বারা পুরুষের বীর্য মহিলার রেহেমের ভিতরে চলে যায় এবং সে বীর্যেই সন্তান জন্ম হয়ে থাকে।

পুরুষদের এই বিশেষ অঙ্গে কোনো প্রকার হাড্ডি নেই। কিন্তু যখন শক্ত ও মজবুত হয়, তখন হাড্ডির মতো শক্ত হয়ে যায়। এটা শুধুমাত্র গোশত ও রগ-শিরা দ্বারা প্রস্তুতকৃত।

এ অঙ্গের বিশেষ বৈশিষ্ট হল, এর দ্বারা যৌনসম্ভোগের কাজ সমাধা কর যায়। অর্থাৎ বীর্য ভাণ্ডারের স্থান পরিবর্তনের কাজটি স্বাদ ও প্রফুল্লতার সাথে সম্পাদন করে থাকে। জ্ঞাতব্য বিষয় হল, পুরুষাঙ্গের প্রসারতার শক্তি অন্তর থেকে হয়ে থাকে। আর তার উপলব্ধি হয় ধমনির দ্বারা। তার খাবার যোগান দেয় কলিজা। কলিজা ও মস্তিষ্ক থেকে পরস্পর মিলনের ইচ্ছাশক্তি জাগে।

বেশিরভাগ সময় পুরুষাঙ্গের দৈর্ঘ্যতা পাশাপাশি ছয়টি আঙ্গুল মিলালে যে পরিমাণ দৈর্ঘ্য হয়, সে পরিমাণ লম্বা বা দীর্ঘ হয়ে থাকে। মহিলাদের গুপ্তাঙ্গের দৈর্ঘ্যতাও ঐ পরিমাণই হয়ে থাকে। যদি কারো পুরুষাঙ্গ লম্বায় ঐ পরিমাণ না হয়, যার কারণে সহবাসের সময় তার লিঙ্গ বাচ্চাদানি পর্যন্ত পৌছে না এবং সহবাসে স্ত্রী পূর্ণাঙ্গ তৃপ্তিও পায় না, তাহলে তাকে সহবাসের সময় ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। আর সেটি হল, তাকে তার যৌনাঙ্গ বৃদ্ধির ঔষধ ব্যবহার করতে হবে, নতুবা সহবাসের সময় স্ত্রীর নিতম্বের নিচে বালিশ বা বালিশের মতো উঁচু জিনিস রেখে সহবাস করতে হবে। এতে স্ত্রী পরিপূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করতে পারবে। এর দ্বারা কারো মনে কোনো প্রকার কষ্ট থাকবে না।

যৌনাঙ্গের উত্তেজনা উপলব্ধি অনেক ভাবেই হতে পারে। পুরুষাঙ্গের লাল বর্ণের শিরা, কালো বর্ণের শিরাগুলো উত্তেজনায় ছটফট করতে থাকে। পুরুষাঙ্গের প্রসারতা, শক্তি ও অনুভূতি শিরা ও ধমনী বেশি হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। পুরুষাঙ্গে প্রথম অংশ তথা মাথা দেখতে খোসাবিহীন সুপারির মতো গোলাকার। সেজন্য তাকে সুপারীও বলা হয়ে থাকে।

পুরুষদের শারীরিক গঠন বৃদ্ধি পাওয়ার সময় পর্যন্ত পুরুষাঙ্গ লম্বা ও মোটা হয়ে থাকে। আর তা হল ত্রিশ থেকে পয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত। এর পর মানুষদের যদিও গঠন বৃদ্ধি পায় কিন্তু পুরুষাঙ্গ বৃদ্ধি পায় না। তবে মোটা ও গোল হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। আর এর জন্য বিভিন্ন ফরমুলা রয়েছে।

পুরুষাঙ্গের দৈর্ঘতা তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা–

১। ছয় থেকে সাত আঙ্গুল পরিমাণ। ২। নয় আঙ্গুল পরিমাণ।

৩। বারো আঙ্গুল পরিমাণ।

সাধারণ লোকদের ছয় থেকে সাত আঙ্গুল পরিমাণ পুরুষাঙ্গ দীর্ঘ হয়ে থাকে। হ্যাণ্ডস্যাম ও মজবুত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকের নয় আঙ্গুল পরিমাণ পুরুষাঙ্গ দীর্ঘ হয়। শক্তিশালী ও লম্বা লোকদের পুরুষাঙ্গ বারো আঙ্গুল পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। তবে এ ধরণের লোক সংখ্যায় একেবারেই কম। যাদের পুরুষাঙ্গ বারো আঙ্গুল পরিমাণ লম্বা এসব পুরুষাঙ্গ ভালো নয়। সাধারণত এসব পুরুষাঙ্গে শক্তি কম থাকে। বিশেষ সময়ে তেমন একটা মজবুত ও শক্ত হয় না। এদের সাথে যেসব মহিলার সহবাস হবে, দীর্ঘতার দিক দিয়ে তাদেরও যথেষ্ট লম্বা হতে হবে। অন্যথায় মহিলারা তাকে সহ্য করতে পারবে না। স্বামী যেমন হবে স্ত্রীও তেমন হতে হবে। এমন যদি হয় যে, স্ত্রী বেশ লম্বা কিন্তু স্বামী একেবারে বেটে, তাহলেও বেমানান। আবার যদি এমন হয় যে, স্বামী অনেক লম্বা কিন্তু স্ত্রী স্বামীর কোমর বরাবর লম্বা, তাহলেও বেমানান। এদের মধ্যে কেউ সহবাসে পূর্ণাঙ্গ তৃপ্তিলাভ করতে পারবে না। এজন্য বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রীর উচ্চতা খেয়াল রাখতে হবে।

আমাদের দেশের পুরুষদের পুরুষাঙ্গ সাধারণত ছয় থেকে সাত আঙ্গুল পরিমাণ লম্বা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মেয়েদের যৌনতৃপ্তি দেয়ার জন্য ছয় থেকে সাত আঙ্গুল পরিমাণ পুরুষাঙ্গ হলেই যথেষ্ট।

এসব ক্ষেত্রে পুরুষ মহিলার মিল না হলে, কেউ পূর্ণাঙ্গতৃপ্তি পায় না। বিশেষ করে মহিলা যদি স্বামী থেকে পূর্ণাঙ্গ তৃপ্তি না পায়, তাহলে তাকে যত কিছুই দেওয়া হোক না কেন, তার সব চাহিদা [এটা ছাড়া] পুরণ করা হোক না কেন, পৃথিবীর রাজত্ব তার হতে দিলেও সে সন্তুষ্ট হবে না। দুনিয়ার সবকিছু দিলেও সে মন থেকে মেনে নিবে না। দুনিয়া সব কিছু, প্রয়োজনের অধিক টাকা পয়সা দিলেও, আসল জিনিসটা মন মতো দিতে পারা গেল না, তাহলে মনে রাখতে হবে [স্ত্রীর মনে হবে] তাকে কিছুই দেওয়া হয় নি। আল্লাহ্ তাআলা পুরুষের এ বিশেষ অঙ্গটি যে কাজের জন্য বানিয়েছেন, এর দ্বারা যদি সে কাজটি পূর্ণাঙ্গভাবে না হয়, তাহলে পুরুষের পুরুষত্ব কোথায়?

অতএব এ বিষয়ে যতেষ্ট যত্নবান হতে হবে। দুনিয়ার জীবনে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করতে চাইলে এ বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণাঙ্গ আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়ার জন্য সব রকম চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

বীর্যপাতের পর ফরয গোসল

বীর্যপাতের পর গোসল করা ফরয। ছেলে বা মেয়ে যে কারো স্বপ্নদোষ হলে তাকে গোসল করতে হবে। কম বা বেশি হোক গোসল করতে হবে। পুরুষদের পুরুষাঙ্গ দিয়ে বীর্যের ন্যায় আরো দু-ধরণের পানি বের হয়। একটির নাম 'অদী' অপরটির নাম 'মযী'।

অদী বলা হয় এক প্রকার সাদা পানিকে। দেখতে ডিমের সাদা অংশের ন্যায়। যা পেশাবের আগে পরে কিংবা পেশাবের সাথে মিশ্রিত হয়ে বের হয়।

মযী এক প্রকার পাতলা পানী, যা সহবাসের খেয়াল আসলে বা মহিলাদের নিকট দীর্ঘক্ষণ বসে আলাপ করলে কিংবা বীর্যপাতের পূর্ব মুহূর্তে পুরুষাঙ্গে মাথায় দেখা যায়। এটা বের হলে গোসল ফরয হয় না, তবে অযু ভেঙ্গে যায়। যেসব স্থানে নাপাকী লেগেছে, সেসব স্থান পাক করে অজু করতে হবে। অন্যথায় শুধু অজু করলেই নিজে পবিত্র হবে না।

মনী বা বীর্য, মযী ও অদী-এগুলোর শরয়ী হুকুম ওলামায়ে কেরাম ও মুফতি সাহেবদের থেকে জেনে নিতে হবে।

অণ্ডকোষ সম্পর্কে কিছু ধারণা

অণ্ডকোষের অবস্থান পুরুষাঙ্গের নিচে। যা দৈর্ঘ্যে দেড় ইঞ্চি, প্রস্থে সোয়া ইঞ্চি, ওজনে আধা ছটাক ডিম্বাকৃতির দুটি কোষ। যার মধ্যে বীর্য প্রস্তুত হয়। এটি একেবারে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা বা ধমনি দ্বারা আবৃত। কোষাকৃতি নল বিশিষ্ট। দৈর্ঘ্যে শরীরের ভিতর দিকে তিন বিঘত। এ রগগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে পরস্পর গিঁট দেয়া হয়, তবে দৈর্ঘ্য দুই মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। শরীরের প্রস্তুতকৃত বীর্য ঐ শিরাগুলি দ্বারা অণ্ডকোষে এসে জমা হয়।

অণ্ডকোষ প্রত্যেক মানুষ ও প্রাণীরই রয়েছে। এটাকে গুদাম ঘর বিশেষও বলা যেতে পারে। মানুষের অণ্ডকোষের গোশত সাদা এবং সবচেয়ে নাযুক স্থান। সামান্য ব্যাথাও অসহ্য মনে হয়। এর ভিতরের গোশত সাদা, এজন্য বীর্যের রঙও সাদা। যেমন মহিলাদের স্তনের ভিতর গোশত সাদা হওয়ার কারণে দুধের রঙও সাদা।

দীর্ঘক্ষণ সহবাস করার পদ্ধতি

পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ মিলবে না, যে দীর্ঘক্ষণ সহবাস করতে

অনিচ্ছুক। যুবক, বৃদ্ধ, মুসলমান, কাফের, বেদীন সকলেরই জীবনের সবচেয়ে বড় চাওয়া স্ত্রীর সাথে দীর্ঘক্ষণ সহবাস করা। এমন আশা দোষণীয় নয়। বরং এমন আশা করাও নেকির অন্তর্ভুক্ত। কেননা স্ত্রী সহবাস করলে, কি উপকার ও ছাওয়াব রয়েছে, ইতিপূর্বে সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণত একজন পুরুষ পূর্ণাঙ্গ কাম-ভাব নিয়ে স্ত্রী সহবাস করলে তিন থেকে সাত মিনিট পর্যন্ত বীর্যকে আটকে রাখতে পারে। এর বেশি কেউ বীর্যকে আটকে রেখেছে বলে আজ পর্যন্ত কোনো তথ্য আসে নি। তবে ভিন্ন চিকিৎসা বা কৌশলের কথা আলাদা। পুরুষের শরীর অধিক গরম এবং খুব দ্রুত বীর্য সৃষ্টি হয় তাই সহবাসের ক্ষেত্রে পুরুষেরা কিছুক্ষণ পরপরই সহবাসে সক্ষম এবং প্রতি সহবাসে বীর্যপাত হয়, এজন্যই তারা মহিলাদের উপর বিজয়ী। প্রক্ষান্তরে মহিলারা কিছুক্ষণ পরপরই সহবাস করতে স্বামীকে সুযোগ দিতে পারলেও তাদের বীর্যপাত হয় না। তাদের শরীর পুরুষের তুলনায় ঠাণ্ডা ফলে তাদের বীর্য সৃষ্টিতে সময়ের প্রয়োজন।

পুরুষদের বীর্য আসে পিঠের মেরুদণ্ডের হাড্ডি থেকে। আর মহিলাদের বীর্য আসে তাদের বুকের হাড্ডি থেকে। এজন্য বেশি উত্তেজিত হলে পুরুষের তুলনায় মহিলার বীর্যপাত আগে হয়ে যায়। যৌন উত্তেজনা যার বেশী হবে, তার বীর্যপাত ততো তাড়াতাড়ি হবে।

একজন পুরুষ এক রাতে একাধিকবার সহবাস করতে সক্ষম এবং প্রত্যেক সহবাসেই তার বীর্যপাত হয়। বীর্যপাত না হওয়ায় একাধিকবার সহবাস করলেও মহিলারা তেমন দুর্বল হয় না, যতটা দুর্বল স্বামী হয়।

বিলম্বে বীর্যপাত

আরবীতে বিলম্বে বীর্যপাত হওয়াকে امساك (ইমসাক) বলে। বিলম্বে বীর্যপাতের মূল কারণ হল- বীর্য গাঢ়, ঠাণ্ডা ও শুকিয়ে যাওয়া। শীতকালে যেমন প্রচণ্ড শীতের কারণে বরফ জমে এবং রোদ্রের কারণে তা ধীরে ধীরে গলে যায়। বীর্য শুকিয়ে যাওয়ার বিষয়টিও হল পাতিলের নিচে আগুন জ্বালানোর দ্বারা তাতে শুকিয়ে থাকা গোশতের শুরবার ন্যায়। যার বীর্য এমনিতেই ঘণ বা দীর্ঘক্ষণ পর বীর্যপাত হয় তার বীর্য গাঢ় করার কোনো ঔষধ সেবন করা উচিত নয়। বিলম্বে বীর্যপাতের বিস্তারিত আলোচনা 'একান্ত গোপনীয় কথা' বইয়ে লিখা হয়েছে।

মহিলাদের যৌন চাহিদা কমানো

কিছু কিছু মহিলা এমন রয়েছে, যাদের যৌনকামনার সামনে পুরুষরা দুর্বল। তাদের যৌনকামনা অধিক বেশি। স্বামীর সাথে সহবাস করে তৃপ্তিলাভ করে না, যৌনক্ষুধা নিভে না। ফলে পরপুরুষের খেয়াল মনে জাগতে থাকে। এক পর্যায়ে অনেকেই পরপুরুষের সাথে দৈহিক কু-সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে যায়। এসব মেয়েদের জন্য যৌন চাহিদা কমানোর ঔষধ খাওয়া আবশ্যক।

পুরুষাঙ্গের প্রকারভেদ

যৌনবিদগণ পুরুষাঙ্গের শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে বলেন-পুরুষের পুরুষাঙ্গ সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত। যথা–

১। শশকীয় পুরুষাঙ্গ।

২। বৃষকীয় পুরুষাঙ্গ।

৩। অশ্বকীয় পুরুষাঙ্গ।

নিম্নে প্রত্যেকটির পরিচয় দেয়া হল-

শশকীয় পুরুষাঙ্গের পরিচয়

শশকীয় পুরুষাঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তিদের বচন হবে, মিষ্ট, মন সদা প্রফুল্ল, তারা দেখতে সুন্দর এবং কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট। তাদের মুখ গোলাকার এবং দেহ মধ্যাকারের। তাদের হাত পা খুব হালকা এবং সুন্দর। তাদের আত্মসম্মান জ্ঞান আছে। গুরু ও জ্ঞানীজনে ভক্তি থাকে। এসব লোকদের পুরুষাঙ্গ ছয় আঙ্গুল লম্বা এবং বীর্য থেকে সুরভি গন্ধ বের হয়। তারা খুব হালকাভাবে বেড়ায় এবং কামেচ্ছা মাঝে মাঝে জাগে।

বৃষকীয় পুরুষাঙ্গের পরিচয়

বৃষকীয় পুরুষাঙ্গের অধিকারী ব্যক্তিরাও কিছু পরিমাণে মিষ্টভাষী হয়ে থাকে। তাদের ঘাড়-গর্দান বলিষ্ঠ, কর্কশ কণ্ঠস্বর, রক্তবর্ণ হস্তপদ এবং গতি চমৎকার। তাদের ভ্রু খাড়া এবং পেট কচ্ছপাকারে গোলাকার। তাদের বীর্য এবং দেহ থেকে লবণাক্ত আস্বাদ বের হয়। তাদের গতি মাঝারি রকমের কিন্তু স্বভাব হয়ে থাকে তিক্ত। তাদের পুরুষাঙ্গ সাধারণত নয় আঙ্গুল পরিমাণ দীর্ঘ হয়ে থাকে।

অশ্বকীয় পুরুষাঙ্গের পরিচয়

এমন লোকেরা সাধারণত বাচাল, মুখ হয় লম্বা। লম্বা ও সরু কান, মাথা ও অধর সরু হয়ে থাকে। তাদের কেশ ঘণ ও সন্নিবিষ্ট ও বক্র। তাদের হাত পা বেশ লম্বা লম্বা এবং দৃঢ়। তাদের আঙ্গুল বেশ লম্বা এবং নখের আঙ্গুলের চেহারা সুগঠিত। তাদের আওয়াজ বা স্বর মেঘ গর্জনবিশেষ। চলাফেরার ক্ষেত্রে তারা খুব দ্রুত পা ফেলে হাটে। তাদের বীর্য থেকে মদের গন্ধ বের হয়। এসব লোকদের পুরুষাঙ্গ প্রায় বারো আঙ্গুল পরিমাণ লম্বা হয়ে থাকে।

স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের পরিচয়

পুরুষের যৌনাঙ্গের মত স্ত্রীর যৌনাঙ্গের দুটি রূপ আছে। একটা বাহ্যিক অপরটা আভ্যন্তরীন। প্রথমে স্ত্রীলোকের প্রজননতন্ত্রের বাহ্যিক রূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

যোনী প্রদেশ

স্ত্রীর প্রজননতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হল তার যোনী প্রদেশ। তলপেটের নিম্নে যেখানে উরুদ্বয় এসে মিশেছে, সেই স্থানে খুব নরম থলথলে মাংস বিশিষ্ট ত্রিকোণাকার একটা জায়গা আছে। তার অগ্রভাগ ক্রমান্বয়ে চিকন বা সরু হয়ে উরুদ্বয়ের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। ঐ স্থানটা তিন হতে সাড়ে তিন ইঞ্চির মত লম্বা হবে। তাকেই বলা হয় যোনী প্রদেশ।

স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের বাহ্যিক রূপ বা অঙ্গ আট প্রকার। যথা-

১। কামাদ্রি	২। বৃহদোষ্ঠ	৩। ক্ষুদ্রদোষ্ঠ	৪। ভগাঙ্কুর
৫। মূত্রনালীর মুখ	৬। যোনীনালী	৭। সতীচ্ছদ	৮। মলদ্বার

নিম্নে এগুলোর আলোচনা ক্রমান্বয়ের করা হল –

কামাদ্রি

স্ত্রীলোকের তলপেটের নিম্নস্থানে যেখানে উরুদ্বয় মিশেছে, ঐ ত্রিকোণ বিশিষ্ট স্থানটাকেই বলা হয় 'কামাদ্রি'। ঐ জায়গার দুই দিকে পুরু চামড়া আর চর্বি থাকে বলে ঈষৎ উঁচু হয়ে থাকে। স্ত্রীলোকের কৈশোর জীবনের শেষে যৌবনে আগমনে ঐ স্থানে লোম গজিয়ে থাকে। এই লোমগুলোর উপর দিয়ে ঐ ত্রিকোণ বিশিষ্ট স্থানটা জুড়ে ক্রমান্বয়ে দুপাশ দিয়ে বাঁকাভাবে নিচের দিকে

নেমে যায়। সঙ্গমাবস্থায় বা অন্যান্য সময় ঐ লোমগুলো স্ত্রীলিঙ্গের নমনীয়তা বজায় রাখে।

বৃহদৌষ্ঠ

কামাদ্রির নিম্নের দিকে ঠিক মাঝখান হতে দুপাশে এক জোড়া পুরু ও চেপটা চামড়ার নিচের ভাঁজ, দেখতে কিছুটা ঠোটের মত। মাংসপেশী প্রায় তিন হতে সাড়ে তিন ইঞ্চি নেমে মলদ্বারে কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। ঐ ঠোটের মত মাংসপেশীদ্বয়কে বলা হয় বৃহদৌষ্ঠ। স্ত্রীলোকের এই বৃহদৌষ্ঠে পুরুষের অণ্ডকোষের ন্যায় কাজ করে থাকে। বৃহদৌষ্ঠের ভিতরটা কোমল ও মসৃণ হয়। কিন্তু তার বাইরের দিকটা কিছুটা কর্কশ ও লোমে আবৃত থাকে। স্ত্রীলোকের যোনীপথ এই মাংসপেশী দ্বারা ঢাকা থাকে। যতদিন পর্যন্ত স্ত্রীলোকের যৌবন অটুট ও সন্তান ধারণশক্তি থাকে, ততদিন পর্যন্ত ঐ ঠোঁট দুটি কিছুটা ফোলা আর কোমল থাকে এবং যোনী-নালীর মুখ কিছুটা চেপে রাখে। কিন্তু যে সময় স্ত্রীলোকের যৌবনে ভাটা দেখা দেয়, আর সন্তান ধারণ ক্ষমতা রহিত হয়ে যায় এবং মাসিক রক্তস্রাব (হায়েজ) চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, তখন এই কোমল মাংসপেশী দুটি কোকড়িয়ে ফাঁক হয়ে যায়। বৃহদৌষ্ঠের শেষ প্রান্তের এক ইঞ্চি নিচেই হল স্ত্রীলোকের মলদ্বার।

ক্ষুদৌষ্ঠ

ক্ষুদৌষ্ঠ দেখতে বৃহদৌষ্ঠের মতো। বৃহদৌষ্ঠের অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত ছোট দ্বিভাজযুক্ত ঠোটের মতো দুই টুকরা চামড়া দুদিক দিয়ে এসে যোনীনালী এবং মুত্রনালীর মুখ ঢেকে ফেলেছে, এটাই ক্ষুদৌষ্ঠ। এই পাতলা মাংসের আস্তরণটা স্থিতিস্থাপক তন্তু দিয়ে গঠিত। স্ত্রীলোকের কামনা-বাসনায় এটা কিছুটা কঠিন হয়ে উঠে। ক্ষুদৌষ্ঠ অতিরিক্ত স্পর্শকাতর এবং সংবেদনশীল। গ্রন্থিগুলো হতে রস নির্গত হওয়ায় স্ত্রীলোকের যোনীনালী সর্বদা ভিজা থাকে বলে পুরুষের লিঙ্গটা স্ত্রীর যোনী-নালীতে খুব সহজেই প্রবেশ করতে পারে।

ভগাঙ্কুর

স্ত্রীলোকের যোনী ফাটলের উপর দিকে সেখানে ক্ষুদ্রৌষ্ঠের মুখ দুটি এসে পরস্পর জোড়া লেগেছে, ঠিক ঐ স্থানটায় একটি ক্ষুদ্র মাংসের পুটলির মতো

দেখা যায়, এটাকেই ভগাঙ্কুর বলা হয়। এই ভগাঙ্কুরের সাথে পুরুষের লিঙ্গাগ্রের বেশ কিছুটা মিল রয়েছে। কিন্তু ভগাঙ্কুরে অনেক বেশি স্নায়ু সন্নিবেশিত হওয়ার কারণে পুরুষের লিঙ্গাগ্র অপেক্ষা অনেক বেশী পুলক সঞ্চারক, সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। স্ত্রীলোকের বাহ্যিক যৌনাঙ্গের ভিতরে এর মতো সুখানুভব ও আনন্দদায়ক অন্য কোনো অঙ্গ নেই। এটা আকারে সাধারণত সিকি ইঞ্চি হতে আধা ইঞ্চি ভিতরে হয়ে থাকে। স্ত্রীলোকের যখন স্বামী সহবাসের ইচ্ছে জাগে, তখন এই ভগাঙ্কুরটি কিছুটা কঠিন হয় এবং তার ভিতরে বিদ্যুতের মতো এক প্রকার শক্তি সঞ্চারিত হয়ে থাকে। ঐ শক্তির জন্য ভগাঙ্কুর অগ্রমনিটা বার বার নাচতে থাকে।

মুত্রনালী

স্ত্রীলোকের যৌনী-মুখের কিছুটা উপরে এবং ভগাঙ্কুরের নিচে তাদের মুত্রনালির মুখ অবস্থিত। মুত্রাশয় হতে বের হয়ে মূত্রনালীটা এই জায়গায় এসে শেষ হয়েছে। পুরুষের থেকে স্ত্রীলোকের মুত্রনালীর বিস্তার বেশী কিন্তু দৈর্ঘ্যে কম। সাধারণত স্ত্রীলোকের মুত্রনালী লম্বায় দেড় ইঞ্চির মত হবে। অনেকের হয়ত এমন ভুল ধারণা হতে পারে যে, স্ত্রীলোকের মুত্রনালী ও যোনীনালীর মুখ দুটি একই। আসলে এটা ঠিক নয়। মুত্র-নালীর অল্প একটু নিচে পিছনে ঘেসে যোনীনালীর অবস্থান।

যোনী-নালী

স্ত্রীলোকের মলদ্বারের উপরে এবং মুত্রনালীর নিচে যোনীনালীর মুখ। স্ত্রীলোক দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলে যোনীনালীকে একটি লম্বা ফাটলের মত দেখা যাবে। কিন্তু শুয়ে থাকাবস্থায় উরুদ্বয়কে উপর দিকে উঠিয়ে ফাঁক করলে তখন যোনীমুখকে একটা ডিমের মত দেখা যাবে। ঐ যোনীমুখ হতে অভ্যন্তরে যে নালীটা জরায়ু পর্যন্ত পৌছেছে তাকেই বলা হয়ে থাকে যোনীনালী। যোনীনালীর প্রাচীরগাত্র সর্বদা চেপে থাকে। কোনো রকম গর্ত বা ফাঁক দেখতে পাওয়া যায় না। একমাত্র যে সময় যোনীমুখে পুরুষাঙ্গ ঢুকানো হয়, তখনই যোনীপথ ফাঁকা হয়ে যায়। এটা ছাড়াও স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব (হায়েজ) ও শ্বেতস্রাবের সময় কিছুটা ফাঁকা হয়ে থাকে। যোনীনালীর সংকোচনতা এবং প্রসারতার ক্ষমতা অদ্ভুত ধরণের। এই কারণে সঙ্গমকালে পুরুষের লিঙ্গটা

ছোট বা বড় হলেও বেশ খাপ খেয়ে যায়। কোনো প্রকার অসুবিধা হয় না স্ত্রীলোকের যোনীনালীর মাপ পাশের দিকে তিন হতে চার ইঞ্চি এবং ভিতরের দিকে পাঁচ হতে ছয় ইঞ্চির মত। স্ত্রীলোকের যৌনাঙ্গটা বিশেষভাবে সংকোচন ও সম্প্রসারণশীল পেশীতন্তু দ্বারা তৈরি। তাতে চাপ পড়লে প্রয়োজন মতো ফাঁকা হয়ে যায়। মেয়েলোকের সন্তান প্রসবের সময় যোনীনালীর অভ্যন্তর ভাগটা খুব নরম হলেও সমতল নয়, কতগুলো অসমান খাঁজে ভরা।

সতীচ্ছদ

স্ত্রীলোকের যোনীনালীর মুখটা ঝিল্লির পাতলা পর্দার একটা আবরণ দ্বারা বন্ধ হয়ে থাকে। এই পর্দাটার নামই হল সতীচ্ছদ। সতীচ্ছদ নানা প্রকারের হয়ে থাকে। সতীচ্ছদের উপরিভাগে দুটি ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্র দ্বারা মেয়েদের ঋতুর (হায়েজের) সময় রক্তস্রাব বের হয়ে থাকে। এই প্রকারের সতীচ্ছদ হল স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো কোনো মেয়েদের সতীচ্ছদে অনেকগুলো ছিদ্র দেখা যায়। আবার তার পাশে করাতের মত খাঁজ কাটাও থাকে। আবার কারো সতীচ্ছদ ছিদ্রশূণ্য দেখা যায়।

মেয়েদের বিবাহের পরে যোনীনালীতে সঙ্গমকালে পুরুষাঙ্গ প্রবেশের সময় অধিকাংশ স্ত্রীলোকের যোনীমুখের ঝিল্লির পর্দাটা ছিড়ে যায়। মেয়েলোকের সতীচ্ছদ না ছেড়া পর্যন্ত পুংলিঙ্গ যোনীনালীতে প্রবেশ করতে পারে না। এই সতীচ্ছদের পর্দা ছেড়ার সময় স্ত্রীলোকের সামান্য ব্যথা পেয়ে থাকে। কোনো কোনো স্ত্রীলোকের কিছুটা রক্তও বের হয়।

আবার কোনো কোনো স্ত্রীলোকের সতীচ্ছদের পর্দাটা বেশ পুরু এবং সম্প্রসারণশীল দেখা যায়। এই অবস্থায় যোনীনালীতে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করতেই পারে না। ফলে স্বামী-স্ত্রীর জন্য দাম্পত্য জীবন কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। এই অবস্থায় ডাক্তার দ্বারা অস্ত্রোপাচার করে সতীচ্ছদ অপসারণ করে নিতে হবে। তবে এটা খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

কুমারী মেয়েলোকের সতীচ্ছদ হয় কিনা

মেয়েদের সতীচ্ছদ পাতলা হলে যৌনমিলন ছাড়াও অন্য কোনো কারণেও তা ছিড়ে যেতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ রকম অবস্থা ঘটতে দেখা যায় যে, মেয়েদের বাল্যকালে বা কৈশোর জীবনে দৌড়াদৌড়ি,

লাফালাফি, সাঁতার কাটা, উঁচু জায়গা হতে নিচে পড়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণে সতিচ্ছদ ছিড়ে যেতে পারে।

অনেক পুরুষেরা এই রকম ধারণা পোষণ করে যে কুমারী মেয়েদের সতীচ্ছদ অক্ষুন্ন থাকবে। এ রকম ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল। এতে অনেক ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবনে কলহ হতে পারে। পুরুষের অগ্রচ্ছাদার সাথে মেয়েলোকের সতীচ্ছদের মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্য আছে। অনেক ছেলেদের জন্ম থেকে দেখা যায়, তাদের অগ্রচ্ছদা একেবারেই মুক্ত। কোনো রকম চামড়ার আবরণ নেই। এটা প্রাকৃতিক ঘটনা। বস্তুতঃ এটা আল্লাহর অসীম কুদরতের নমুনা। ইসলামী সমাজে এটাকে মুসলমানী সুন্নত বলা হয়ে থাকে।

বুঝা গেল যে, মেয়েদের বেলায়ও এই প্রকারে ছিন্ন সতীচ্ছদ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব নয়। অর্থাৎ সতীচ্ছদ ছাড়াও মেয়েরা জন্মগ্রহণ করে। এ নিয়ে তর্ক- বিতর্ক করা উচিত নয়।

স্ত্রীলোকের যৌনাঙ্গ সম্পর্কে তার বাহ্যিক রূপের মোটামুটি পরিচয়ের পর এখন আভ্যন্তরীন বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

মেয়েলোকের যৌনাঙ্গের ক্ষুদ্রৌষ্ঠ আর মুত্রনালীর ঠিক মাঝখানে আধা ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত গোলাকার সিমের বিচির মত দুটি গ্রন্থি দেখা যায়, এই গ্রন্থি হতে দুটি সরু নল বের হয়ে যোনী মুখের নিকট এসে শেষ হয়েছে। এই গ্রন্থি দুটি সান্দনী গ্রন্থি। এই গ্রন্থি হতে সর্বদা এক প্রকার আঠা আঠা পিচ্ছল রস বের হতে থাকে। স্ত্রীলোকের কামনাবাসনার সময় এই রস অধিক পরিমাণে বের হয়। আবার ঐ রস স্বাভাবিকভাবে সর্বদা কিছু কিছু বের হতে থাকে। এই রস বের হয়ে যোনীনালীকে সর্বক্ষণ ভিজিয়ে রাখে বলে রতিক্রিয়ার সময় কষ্ট হয় না এবং হাঁটাচলায় ঘর্ষণে ব্যথা পায় না। স্ত্রীলোকের সানন্দী পুরুষাঙ্গের কাউপার গ্রন্থির সাথে কিছুটা মিল আছে।

স্ত্রী-প্রজননতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলোর নাম

১। ফাণ্ডাস ২। জরায়ু দেহ ৩। জরায়ু-গ্রীবা ৪। জরায়ু মুখ
৫। যোনীনালী ৬। যোনীপথ ৭। বৃহদ্রৌষ্ঠ ৮। ক্ষুদ্রৌষ্ঠ
৯। মূত্রাশয় ১০। ভগ্নাঙ্কুর ১১। মলদ্বার
১২। আভ্যন্তরীণ যৌনী-প্রাচীর ১৩। বাইরের যোনী-প্রাচীর।

জরায়ু

পেঁপে বা লাউ উল্টে ধরলে যে রকম দেখতে পাওয়া যায়, মেয়েদের জরায়ুটা তদ্রূপ। অথবা কিছুটা পানের বটুয়া বা রাবারের বেলুনের মত হয়ে থাকে। তার গলাটা চিকন এবং পেটটা মোটা। এটা লম্বায় তিন ইঞ্চি হয় এবং চওড়ায় দুইঞ্চি হতে আড়াই ইঞ্চি হয়ে থাকে। এই জরায়ুর ভিতরেই ভ্রুণের আবির্ভাব এবং ক্রমবৃদ্ধি হয়ে থাকে। জরায়ুর অভ্যন্তরীণ প্রাচীর এক প্রকার ঝিল্লি দ্বারা আবৃত। এর জন্য জরায়ুর ভ্রুণ বিকাশোপযোগী হয়। মোটামোটিভাবে জবায়ুর তিনটি অংশ আছে।

জরায়ুর উপরের অংশকে ফাণ্ডাস, মধ্যের ফুলা চওড়া অংশটিকে জরায়ুর দেহ এবং নিচের চিকন মুখকে জরায়ুর গ্রীবা বলা হয়।

মেয়েদের জরায়ুর আকৃতি ত্রিভূজের মতো। তলপেটের গহব্বরে উপরের ভাগে এর অবস্থান। উপরের মোটা ভাগ উঁচুদিকে হেলে থেকে সরু জরায়ুগ্রীবা একটি গোল আধারের মতো মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে যোনীনালীর শেষ ভাগের সাথে এসে মিশেছে। যোনীর সীমা পর্যন্ত এই অংশটুকুকে তলপেটের মুখ বলা হয়। একটি সরু ছিদ্রপথ বরাবর জরায়ুর ভিতর গিয়ে শেষ হয়েছে। মেয়েদের সন্তান প্রসবের সময় এই সরু ছিদ্র পথটি বেশ চওড়া হয়ে যায়। গর্ভের শেষ অবস্থায় প্রসবকালে জরায়ুর মাপ দশ হতে এগোরো ইঞ্চির মতো হয়ে থাকে। প্রসবান্তে জরায়ুটা এক দেড় মাসের ভিতরে পূণরায় আস্তে ধীরে ছোট হয়ে যায়। জরায়ুর অবস্থান মেয়েদের মলপ্রকোষ্ঠ আর মুত্রাশয়ের মাঝ বরাবর।

ডিম্বকোষ

স্ত্রীলোকের ডিম্ববাহী নলের নিচে জরায়ুর দুদিকে বাদামের মতো আকৃতি বিশিষ্ট দুটি গ্রন্থিকে বলা হয় ডিম্বকোষ। দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই ইঞ্চি এবং প্রস্থে এক ইঞ্চির মতো। এখানে গর্ভ সঞ্চারণের জন্য অসংখ্য ডিম্ব সৃষ্টি ছাড়াও এক প্রকার রস বের হয়। পুরুষের পৌরুষত্ব, সৌন্দর্য এবং মাতৃত্বের পরিপূর্ণতা এর দ্বারা বিকশিত হয়ে থাকে। নারীর যৌবনের লাবণ্যতা, কাম-বাসনা, প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা ইত্যাদি এই ডিম্বাকোষের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। যে সকল স্ত্রীলোকের রোগের কারণে ডিম্বকোষ অস্ত্রোপাচার করে অপসারণ করা হয়েছে তাদের লাবণ্যময়ী সৌন্দর্য মাঝ পথেই হারিয়ে গেছে। শরীর শুকনা, ঋতুস্রাব, এবং সন্তান ধারণের শক্তি চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষ না থাকলে তাদের জন্মের উদ্দেশ্যই বৃথা। তাদের রূপ-যৌবন আর মাতৃ-জীবনের স্বপ্নময়ী আশা আকাঙ্ক্ষাও হারিয়ে যায়।

ডিম্ববাহী নল

মেয়েদের জরায়ু আর ডিম্বকোষের মাঝে সংযোগ রক্ষাকারী দুটি সরু নল স্থাপিত আছে। ঐ নল দুটি জরায়ুর দেহে যে স্থানে মিশেছে, তা দৈর্ঘ্যে প্রায় পাঁচ/ছয় ইঞ্চির মতো হবে। এটি ক্রমান্বয়ে চওড়া হতে হতে তার শেষ প্রান্ত ঝালরের মতো হয়েছে।

জরায়ুর দুই পাশের এই নলের মধ্য দিয়ে ডিম্বকোষ হতে ডিম্ব বের হয়ে জরায়ুর ভিতরে পড়ে এবং মেয়েদের মাসিক ঋতুকালে রক্তের সাথে যোনীনালী দিয়ে বের হয়ে যায়।

যৌনাঙ্গের প্রকারভেদ

যৌনবিদগণ পুরুষাঙ্গের শ্রেণীবিন্যাস করার সাথে সাথে মহিলাদের যৌনাঙ্গের শ্রেণী বিন্যাসও করেছেন। মহিলাদের যৌনাঙ্গ সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত। যথা–

১। হরিণী যোনি বা যৌনাঙ্গ।

২। ঘোটকী যোনি বা যৌনাঙ্গ।

৩। হস্তিনী যোনি বা যৌনাঙ্গ।

হরিণী যোনি বা যৌনাঙ্গ

এদের চটুল চক্ষুতে লাল রেখা থাকে। তাদের মুখ পদ্মের মত প্রফুল্ল, বাবলা জাতীয় গাছের ফুলের মতো তাদের গায়ের চামড়া কোমল হয়।

এদের স্তনও হয় কদম গাছের ফুলের মতো গোলাকার ও নরম। গায়ের চামড়া হয় চম্পা পুষ্পের মতো শ্বেতবর্ণ। তাদের নাসিকা হয় টিয়া পাখীর নাসিকার ন্যায় তীক্ষ্ণ ও লম্বা। তাদের হাত হয় মুক্তার ন্যায়। রাজহংসীর মতো হয় তাদের চলন। কণ্ঠস্বর হয় কোকিলের ন্যায় সুমধুর। হরিণীর মতো হয় গ্রীবা। তারা গুরুজন, ইমাম, শিক্ষক ও আল্লাহ্‌ভক্ত।

সাদা পোশাক পরিধান করতে তারা বেশ আগ্রহী। খাবার খেয়ে থাকে পরিমাণে সামান্য। তবে তারা বিলাসবর্তী হয় না। তথাপি অনুভূতিতে বেশ

পারদর্শিনী। কথা খুব কম বলে এবং নিদ্রা তুলনামূলক কম। তাদের যোনি ছয় আঙ্গুল পরিমাণ গভীর এবং পদ্মগন্ধা।

ঘোটকী যোনি বা যৌনাঙ্গ

কৃশা ও স্থুলকায় হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকায় বহূবর্ণ বিশিষ্ট বেশভূষা এদের বেশ প্রিয় জিনিস। এরা ধৈর্যহীনা। এদের স্তন হয় শিথিল। চক্ষু হয় কাপর্দ বা শ্যামবর্ণ কিন্তু বাঁকা চোখে কটাক্ষ মারতে খুব পটু। এদের চলন বেশ দ্রুত।

পুরুষের সাথে সহবাসে বেশ প্রিয় এবং সহাবাসের সময় পুরুষকে দংশন, আঁচড় এবং চিমটিতে বড়ই অগ্রসর। সুযোগ পেলে মদও পান করে। এদের কণ্ঠস্বর কর্কশ ও চিৎকার প্রবণ। লম্বা লম্বা দাঁত এবং খাড়া খাড়া চুলই এদের বিশেষত্ব। ঘুমের দিকে দিয়ে বেশ পটু। এদের যোনি হয় নয় আঙ্গুল পরিমাণ গভীর এবং মৎস্যাগন্ধা।

হস্তীনি যোনি বা যৌনাঙ্গ

এদের গতি ভঙ্গী হস্তীনির মতো। এদের আঙ্গুল হয় মাংসল এবং বাঁকা বাঁকা। গ্রীবা হ্রস্ব এবং মাংসল হয়ে থাকে। ওষ্ঠাধর হয় পুরু পুরু। নিতম্ব বা পাছা বেশ চর্বিযুক্ত। খাওয়ার বেলায় অনেককে হার মানিয়ে দেয়। এদের নিদ্রা হস্তিনীর মতই।

এদের শরীরে বেশ লোম থাকতে দেখা যায়। আচার ব্যাবহার হয় নির্লজ্জ। পুরুষের সাথে সহবাসে সর্বদাই প্রস্তুত থাকে। তবে বেশিরভাগই দেখা যায় কেবল অর্থের বিনিময়ে সহবাস করে থাকে।

এদের যোনি বেশ প্রশস্ত এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো ধরণের পুরুষাঙ্গ ধারণ করতে সক্ষম।

নারীর যোনি

পুরুষদের পুরুষাঙ্গ যেমন ছয়, নয় এবং বারো আঙ্গুল লম্বা হতে পারে। ঠিক নারীর যোনিও ছয়, নয় ও বারো আঙ্গুল গভীর হতে পারে। কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী বা উত্তেজনায় এদের যোনির ব্যাস মাংসপেশীর ক্রিয়ার দরুন কম-বেশি হতে পারে।

পুরুষের পুরুষাঙ্গ এবং নারীর যৌনাঙ্গ যদি সমান ব্যাসবিশিষ্ট ও দৈর্ঘ যুক্ত

হয়, তাহলে সহবাসের সময় উভয়ে বেশ আনন্দ পেতে পারে। একে বলে পূর্ণ মিলন বা সমআনন্দ।

মহিলাদের ঋতুস্রাব বা হায়েজ

বাংলাদেশের মেয়েরা সাধারণত বারো হতে ষোল বছর বয়সের ভিতরে হায়েজ বা মাসিক ঋতুস্রাব দেখে থাকে। আমাদের আবহাওয়া গরম বিধায় মেয়েরা এত কম বয়সে ঋতু বা হায়েজ দেখে থাকে। প্রতি মাসে মেয়েদের এই হায়েজ বা ঋতুস্রাব একবার হয়ে থাকে বলে এটাকে মাসিকও বলা হয়। মেয়েদের হায়েজ বা ঋতুস্রাব পঞ্চান্ন বছর বয়স পর্যন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু শরীয়ত মতে নয় বছর বয়সেও হায়েজ হয় এবং পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত তার স্থায়ীত্ব থাকে। গর্ভাবস্থায় মেয়েদের হায়েজ বা ঋতুস্রাব হয় না। যদি কারো হয় তাহলে তাকে গর্ভস্রাব বলা হয়।

স্ত্রীলোকের পঞ্চান্ন বছর বয়সের পরে ঋতুস্রাব দেখা যায় না। এর পরে গর্ভধারণের ক্ষমতা থাকে না। তখন তারা বার্ধক্যে পৌছে যায়।

নিয়মতান্ত্রিক ঋতুস্রাব হওয়া মহিলাদের জন্য সুসংবাদ। অনিয়মতান্ত্রিক ঋতুস্রাব হওয়া তাদের দুর্ভোগের কারণ। ঋতুস্রাব সময়ে সহবাস অনুচিত। এতে উভয়েই মারাত্মক রোগে আক্রান্তের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে এবং এ সময় সহবাস করা শরীয়ত কর্তৃক কড়াভাবে নিষিদ্ধ। ঋতুস্রাবের সময় সব ধরনের ঠাণ্ডা থেকে দূরে থাকা উচিত। এমনকি ঠাণ্ডা পানিতে হাত, বৃষ্টির পানিতে গোসল কিংবা শরীরে বেশি ঠাণ্ডা লাগালে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ঋতুস্রাবের সময় অধিক দৌড়ঝাপ, মেহনত, বোঝা উঠানো এবং এ জাতীয় ভারী কোনো কাজ না করা। প্রচণ্ড গরম এবং অধিক চা পান এ সময়ের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

হায়েয সম্পর্কে ভুল ধারণা

হায়েয বা ঋতুস্রাব সম্পর্কে অনেকের ধারণা, মহিলারা গর্ভবতী হলে, ঋতুস্রাবের রক্ত পেটের বাচ্চার খাবার হয়ে থাকে। বাচ্চা এ রক্ত খেয়ে জীবিত থাকে। এটা একেবারেই ঠিক নয়। ঋতুস্রাবের রক্ত বড়ই দুর্গন্ধ ও পচা বস্তু। যা শরীরে লাগলেও ঘৃণা আসে, সেটা কিভাবে মাসুম বাচ্চার খাবার হতে পারে? বাচ্চার শরীর একেবারে তুলতুলে, তার মেজাযও একেবারে কোমল,

সব ধরণের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত এবং গঠনপ্রকৃতিও একেবারে দুর্বল। সুতরাং রিযিকদাতা আল্লাহ্ কিভাবে এ ঘৃণ্য খাবার বাচ্চাকে দিতে পারেন?

প্রশ্ন হল, গর্ভাবস্থায় ঋতুস্রাবের রক্ত কোথায় যায়?

জবাবঃ কোনো মহিলা গর্ভবতী হলে, ঋতুস্রাবের রক্ত বাইরে আসা বন্ধ হয়ে যায়। বাচ্চা জন্মের সময় এ রক্তে পিচ্ছিল অবস্থায় ভুমিষ্ট হয়। এজন্যই ভুমিষ্ট হওয়ার সময় মহিলাদের মাত্রাতিরিক্ত রক্ত বের হয়।

গর্ভস্ত সন্তানের খাবার এসে থাকে মায়ের ভালো রক্ত থেকে। আর যে রক্ত খাওয়ার উপযুক্ত নয়, সে রক্ত বাচ্চা জন্মের সময় এবং পরবর্তী দিনগুলোতে বের হতে থাকে। আরবী ভাষায় একে নেফাস বলে। ঋতুস্রাবের রক্ত তিনভাগে বিভক্ত। ১। যে রক্ত ফিলটার করা বা ফ্রেস কেবল সে রক্তই বাচ্চার খাবার ২। ঐ রক্ত যা বাচ্চার দুধের জন্য স্তনের দিকে চলে যায় ৩। ঐ রক্ত যা সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত বন্ধ থাকে, সন্তান জন্মের সময় এবং পরে বের হয়ে যায়।

জরুরি কথা

যেসব মহিলার ঋতুস্রাব বা হায়েয আসে না, সে মহিলা সন্তান ধারণে অক্ষম। তার থেকে কখনো সন্তান জন্ম নিবে না।

ঋতুস্রাব বা হায়েজের সময়কাল বা স্থায়িত্ব

মেয়েলোকের প্রতিমাসে জরায়ু হতে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যৌননালী দিয়ে যে রক্ত বের হয়ে আসে তাকে ঋতুস্রাব বা হায়েজ বলা হয়।

হায়েজের সর্বনিম্ন সময়কাল তিনদিন তিনরাত। সর্বোচ্চ সময়কাল দশ দিন দশ রাত। এর পরের রক্তস্রাব এস্তেহাজার (রোগ) হিসাবে গণ্য হবে।

হায়েজের নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়কাল (মুদ্দত)

মেয়েদের সর্বপ্রথম মাসে যে কয়দিন হায়েজ (ঋতুস্রাব) থাকে ঐ কয়দিনকেই তার নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়কাল (মুদ্দত) বলে জানতে হবে। এটা ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ও ইমাম মোহাম্মদ (রহঃ) উভয়ের মত এবং এই মতের উপরই ফতোয়া হয়েছে।

হায়েজের রং ও পরিমাণ

হায়েজের (ঋতুস্রাবের) রং ছয় প্রকারের হয়ে থাকে। যথা-

১। লাল। ২। কালো। ৩। হলুদ। ৪। সবুজ।
৫। স্বেত মিশ্রিত লাল ও ৬। কালো মিশ্রিত লাল।

হায়েজের রক্তের পরিমাণ অবস্থাভেদে দুই হতে তিন ছটাকের মতো হয়ে থাকে, কিন্তু সবসময় এ পরিমাণ ঠিক থাকে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রক্তের পরিমাণ অনেক বেশি হয় তখন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

বেশি রক্তস্রাবের কারণ ও প্রতিকার

যে সকল মেয়েদের স্বাভাবিক নিয়মে ঋতুস্রাব হয়, তাদের দৈহিক স্বাস্থ্য দিন দিন উন্নত হতে থাকে। যাদের অতি বেশি রক্তস্রাব হয়, তাদের রোগ বলে মনে করতে হবে। এই রোগকে অতিস্রাব বা রক্তপ্রদর বলা হয়। যাদের শরীর দুর্বল, রক্ত কম, স্বাস্থ্য রোগা, তারাই এই রোগে বেশি ভুগে।

মেয়েদের জরায়ুর ভিতরে ঝিল্লিযুক্ত অংশের ফুলা ফুলা অবস্থাই বেশি ঋতুস্রাবের কারণ। এটা ছাড়াও আরও কিছু কারণে বেশি স্রাব হয়। যেমন- জরায়ুতে ঘা, জরায়ুর স্থান পরিবর্তন, জরায়ু বড়, জরায়ু ছিড়ে গেলে অথবা সন্তান ভুমিষ্ঠের পরে ফুলের কোনো কচি আটকিয়ে থাকলে ইত্যাদি।

যদি কোনো মেয়েলোকের অতিরিক্ত স্রাব হতে থাকে, তবে দেখতে হবে তার এ স্রাবের কারণে নারীদেহ শুকিয়ে যাচ্ছে কিনা এবং ঐ স্রাবে চাঁপবাধা কালো কালো খণ্ড রক্ত আসে কিনা? সাধারণত নিয়মিত স্রাবে রক্ত চাঁপবাধা কালো রং হয় না। অবশ্য জরায়ুর ভিতরে শ্লেম্মাদির সংমিশ্রণ থাকলে স্রাবের রক্তে চাঁপবাধা কালো রং হয় না। কিন্তু অতিরিক্ত ঋতুস্রাব হলে শ্লেম্মাদির চেয়ে রক্তের পরিমাণ বেশি থাকে বলে সহজেই চাঁপ বেধে যায়। ঐ ধরণের অতিরিক্ত রক্তস্রাবে ডাক্তারি ঔষধ ছাড়াও মেয়েলোকের কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। যেমন- বেশি পরিশ্রম না করা, অধিক রাত না জাগা, বার বার কামনা-বাসনায় না পড়া, অতিমাত্রায় রতিক্রিয়া না করা ইত্যাদি মানা দ্বারা অতিরিক্ত রক্তস্রাব হওয়ার আশংকা থাকে না। যারা ঐ নিয়ম-কানুন মানে না তাদেরই অস্বাভাবিক রক্তস্রাব হয়ে থাকে। তাই নারীদের নিরোগ ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য ঐ সকল কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করে চলতে হবে। তাহলে ঐ ধরণের রোগ ব্যাধি হতে পরিত্রাণ পাবে।

প্রতিষেধক

যাদের অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয় তারা পরিশ্রমের কাজ কর্ম একটুও করবে না। খোলা জায়গায় আলো বাতাসে হাঁটাচলা করবে। উঁচু-নিচু স্থানে হাঁটবে না। সম্ভব হলে হালকা ব্যায়াম করবে। অতিরিক্ত রক্তস্রাবের সময় একটি বালিশ কোমরের নিচে রেখে চিৎভাবে শুয়ে কোমরটাকে চার পাঁচ ইঞ্চি উঁচা করে রাখলে অতিরিক্ত স্রাব বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

এইসব মেয়েদের লঘুপাক পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে এবং বেশি পরিমাণে দুধ পান করতে হবে। অবশ্য নিয়মিতভাবে দুধ পান করতে পারলে খুবই উপকারে আসবে। গুরুপাক খাদ্য পরিহার করতে হবে। এছাড়া ভালো ফল খেতে চেষ্টা করবে। তবে ঐ অবস্থায় আনারস ফল না খাওয়া উচিত।

সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল, কোষ্ঠ কাঠিন্য যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবে। অর্থাৎ পায়খানা যাতে পরিষ্কার হয় সেদিকে বেশি খেয়াল রাখবে।

হায়েযের কতিপয় মাসআলা

◆ হায়েয চলাকালীন সকল প্রকার নামায-রোযা আদায় করা নিষেধ। তবে নামায ও রোযার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। হায়েযের কারণে নামায একেবারে মাফ হয়ে যায়, কিন্তু রোযা সাময়িকের জন্য মাফ হয়, পরবর্তীতে আদায় করতে হয়। কিন্তু নামায আর কখনো আদায় করতে হয় না।

◆ সুন্নত বা নফল নামাযরত অবস্থায় হায়েয দেখা দিলে, সাময়িকের জন্য মাফ হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে তা কাযা করতে হয়। দিনে রোযা অর্ধেকের পর হায়েয দেখা দিলেও একই হুকুম। সাময়িকের জন্য মাফ হয়ে যাবে কিন্তু পরবর্তীতে কাযা করতে হবে। নফল রোযার ক্ষেত্রে একই হুকুম।

◆ ফরয নামায চলন্তাবস্থায় হায়েয দেখা দিলে নামায ফাসেদ হয়ে যায় এবং সে ওয়াক্তের নামাযও মাফ হয়ে যায়।

◆ নামাযের শেষ ওয়াক্তে হায়েয দেখা দিলে যদি সে ওয়াক্তের নামায এখনও আদায় না করে, তবে নামায মাফ হয়ে যাবে কাযা করতে হবে না।

◆ রমযান মাসে হায়েয হলে দিনের বেলা পবিত্র হলেও সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার করা নিষেধ। রোযাদারের মতো না খেয়ে থাকা ওয়াজিব। তবে ঐ দিন রোযার মধ্যে গণ্য হবে না; বরং ঐ দিনের রোযা কাযা করতে হবে।

◆ হায়েয অবস্থায় যে কাপড় পরিধান করেছিল, তাতে হায়েযের নাপাকি বা ভিন্ন কোনো নাপাকী লেগে না থাকে, তাহলে সে কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করতে পারবে। এতে কোনো সমস্যা নেই। আর যদি কোনো স্থানে নাপাক লেগে থাকে, তাহলে কেবল সে স্থানটুকই ধৌত করলে যথেষ্ট। পূর্ণাঙ্গ কাপড় ধৌত করার প্রয়োজন নেই।

◆ হায়েয চলাকালীন সময়ে স্ত্রী সহবাস করা হারাম। তবে একত্রে চলা-ফেরা, খাবার-দাবার, ঘুম, শয্যাগ্রহণ করা সবই জায়েয। কিন্তু স্বামী তার স্ত্রীর হাটু থেকে নাভি পর্যন্ত স্থানে তার কোনো অঙ্গ স্পর্শ করে লজ্জত হাসেল করতে পারবে না। এ মুহূর্তে স্বামী তার স্ত্রী থেকে যৌন ক্ষুধা মিটাতে পারে না। শরীয়ত মতে হারাম হওয়ার সাথে সাথে হেকিমী মতেও বিভিন্ন রোগ সৃষ্টির কারণ। যদি স্বামী এ মুহূর্তে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চায়, তাহলে স্বামীকে নরম সুরে বুঝাবে। কথা না মানলে, কোনো ক্রমেই রাজী হবে না। কেননা পাপ কাজে কারো কথা মানতে নেই। নিতান্তই যদি যৌন ক্ষুধায় লিপ্ত হয়, তাহলে উভয়েই কবিরা গোনাহে গোনাহগার হবে।

◆ হায়েয চলাকালীন স্বামী তার স্ত্রীর নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত স্থানে হাত বা কোনো অঙ্গ লাগাবে না। কিন্তু নাভীর উপর থেকে মাথা পর্যন্ত অন্যান্য স্থানে হাত লাগাতে পারবে এমনকি চুমুও দিতে পারবে।

◆ কারো পাঁচ দিন বা নয় দিন নিয়মিত হায়েয আসত। সে নিয়ম মতো হায়েয হয়ে বন্ধ হয়ে গেল; সুতরাং যতক্ষণ গোসল না করবে, ততক্ষণ স্বামী সহবাস করতে পারবে না। তবে যদি এ অবস্থায় এক ওয়াক্ত নামায চলে যায় এবং এর মধ্যে রক্তস্রাব না আসে, তাহলে বিনা গোসলে সহবাস করতে পারবে। এর পূর্বে সহবাস ঠিক হবে না।

◆ পুর্ণাঙ্গ দশ দিন দশ রাত রক্তস্রাব হয়ে বন্ধ হয়ে গেলে সহবাস করাতে কোনো সমস্যা নেই। গোসল করুক বা না করুক।

◆ হায়েয চলাকালীন মহিলার শরীর ও মুখের লালা পাক। অন্য কোনো নাপাকী শরীরে থাকে সেটি ভিন্ন কথা। কেবল হায়েযের কারণে শরীর নাপাক বলা যাবে না। এ অবস্থায় শরীরে ছোঁয়া লাগলে বা স্বামী স্ত্রীর মুখের ভিতর জিহ্বা প্রবেশ করালে তাতে নাপাক হবার কিছু নেই।

◆ একদিন কিংবা দুদিন রক্তস্রাব হয়ে বন্ধ হয়ে গেলে গোসল করা ওয়াজিব নয়, অযু করে নামায পড়বে; কিন্তু সহবাস করা যাবে না। কেননা

পনের দিনের মধ্যে রক্তস্রাব শুরু হলে বুঝতে হবে যে, সেটা হায়েযের সময় ছিল। আর যদি পনের দিনের মধ্যে রক্তস্রাব দেখা না যায়; তবে প্রথম দু-এক দিনের রক্তস্রাব ইস্তেহাযা বলে বিবেচিত হবে এবং সে সময়কার নামাযও (যা আদায় করা হয় নি) কাযা করতে হবে।

নেফাস বিষয়ক কিছু কথা

◆ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মহিলাদের যোনি থেকে যে রক্তস্রাব হয়, তাকেই নেফাস বলে।

◆ এক গর্ভে একাধিক সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে (৬ মাসের মধ্যে) প্রথম বাচ্চা ভূমিষ্ঠের পর থেকেই নেফাসের মেয়াদ গণনা করতে হবে। দ্বিতীয় সন্তান থেকে নয়।

◆ নেফাসের ঊর্ধ্ব মেয়াদ চল্লিশ দিন, নিম্ন মেয়াদের কোনো সময় সীমা নেই। দু-চার দিন বা এক-আধ ঘণ্টাও হতে পারে। এমনকি সন্তান প্রসবের পর রক্ত নাও আসতে পারে।

◆ প্রসবের পর একেবারে রক্ত না আসলেও গোসল করা ওয়াজিব।

◆ নেফাসের সময়সীমার মধ্যে সব সময় রক্ত আসতে হবে এমন নয়, বরং মেয়াদের ভিতরে মাঝে মধ্যে দুচার ঘণ্টা বা দুচার দিন বন্ধও থাকতে পারে। বন্ধ হওয়ার পর যদি আবার আসে, তাহলে মাঝখানের সময়কেও নেফাসের সময় ধরা হবে।

নেফাসের কতিপয় মাসআলা

◆ চল্লিশ দিনের কমে নেফাসের রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে, তাড়াতাড়ি গোসল করে নামায পড়তে আরম্ভ করবে। যদি গোসল করলে রোগ বৃদ্ধির সম্ভবনা থাকে, তাহলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করবে। সাবধান! কোনোক্রমেই নামায ত্যাগ করবে না। নামায ত্যাগের কোনো সুযোগ নেই।

◆ অনেক এলাকায় এ প্রচলন আছে যে, চল্লিশ দিনের কম সময়ে নেফাস বন্ধ হলেও নামায রোযা আদায় করা যাবে না বরং চল্লিশ দিন পার হতেই হবে। এটি সম্পূর্ণ ভুল। বরং যখনই রক্ত আসা বন্ধ হবে, তখনই গোসল করে নামায আদায় করতে হবে।

◆ চল্লিশ দিন অতিক্রম করেও যদি কারো রক্তস্রাব আসে, তাহলে চল্লিশ দিনের অতিরিক্ত দিনগুলোকে ইস্তেহাযা সাব্যস্ত করে ইস্তেহাযার মাসআলা অনুযায়ী প্রতি ওয়াক্তে অযু করে নামায আদায় করা শুরু করবে। যদি এটা জীবনের প্রথম নেফাস না হয়ে থাকে, তাহলে ইতিপূর্বে তার কত দিন নেফাস ছিল, তা নির্ধারণ করে বাকি দিনগুলোকে ইস্তেহাযা সাব্যস্ত করে অনাদায়ি নামাযগুলো কাযা করে নিবে।

◆ কারো পূর্বে নিয়ম ছিল ত্রিশ দিন নেফাসের। কিন্তু এবার ত্রিশ দিনে তা বন্ধ হল না; এমতাবস্থায় সে গোসল না করে অপেক্ষা করবে। যদি চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়ে স্রাব বন্ধ হয় তবে এই চল্লিশ দিনই নেফাস। আর যদি চল্লিশ দিনের বেশী রক্ত প্রবাহিত হয়, তবে আগের অভ্যাস অনুযায়ী ত্রিশ দিন নেফাস এবং অবশিষ্ট দিনগুলো ইস্তেহাযায় গণ্য হবে। চল্লিশ দিন পর গোসল করে পবিত্র হবে এবং ত্রিশের পরের দশ দিনের নামায কাযা পড়বে।

◆ নেফাসের সময়ও নামায সম্পূর্ণ মাফ, তবে রোযা মাফ নয়। রোযা কাযা করতে হবে।

◆ নেফাসের সময়ও সহবাস ও হাটু থেকে নাভি পর্যন্ত স্থান ভোগ করা হারাম। তবে একত্রে খাবার-দাবার, চলা-ফেরা, বিশ্রাম ও শয্যাগ্রহণ সবই করা যাবে।

হায়েয-নেফাসের বিবিধ মাসায়েল

◆ হায়েয নেফাস চলাকালিন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করা যাবে না। অর্থাৎ গোসল ওয়াজিব থাকা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ, কা'বা শরীফের তাওয়াফ করা, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও স্পর্শ করা সবই নিষেধ। তবে কুরআন শরীফ যদি গেলাফ দ্বারা মোড়ানো থাকে বা আলগা কাপড় দ্বারা পেচানো থাকে, তাহলে প্রয়োজনে স্পর্শ করা যাবে।

◆ নাপাক হালতে কুরআনের একটি পরিপূর্ণ আয়াত পড়া ঠিক নয়, তবে একটি ছোট আয়াত বা তার চেয়ে কম হলে পড়া যাবে।

◆ অযুবিহীন কুরআন শরীফ স্পর্শ করা যায় না, মৌখিকভাবে পড়া যায়।

◆ পরিহিত কাপড় দ্বারা কুরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয নেই। তবে আলগা কাপড় দ্বারা স্পর্শ করা যাবে।

◆ টাকা-পয়সা, তশতরী, রুমাল, তাবিজ অথবা অন্য কোনো বস্তুতে কুরআনের আয়াত লেখা থাকলে, নাপাক অবস্থায় অর্থাৎ হায়েয নেফাসওয়ালী মহিলারা ও যাদের উপর গোসল ওয়াজিব হয়েছে, তারা কেউ তা স্পর্শ করতে পারবে না। তবে যদি কোনো পাত্রে বা থলিতে রক্ষিত থাকে, তবে সে পাত্র স্পর্শ করা যাবে।

◆ দোয়ার নিয়তে যদি সূরা ফাতিহা বা কুরআন শরীফে যে সকল আয়াত দুআ মুনাজাত সম্বলিত, তিলাওয়াতের নিয়ত বাদে কেবল দুআর নিয়তে পাঠ করে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।

◆ প্রতি ওয়াক্তে হায়েয নেফাসওয়ালী মহিলারা সত্তর বার ইস্তেগফার পড়লে এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার সওয়াব পাবে।

◆ কারো উপর গোসল ফরয ছিল এবং গোসল শেষ করার পূর্বেই ঋতুস্রাব শুরু হল, এমতাবস্থায় তার উপর গোসল করা ওয়াজিব নয়। বরং ঋতু হতে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করবে। এ গোসলই উভয় প্রকার গোসলের জন্য যথেষ্ট হবে।

◆ পবিত্র হজ্জের যাবতীয় কার্যক্রম সুন্দরভাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার জন্য যদি মহিলারা এমন ঔষধ ব্যবহার করে, যা সাময়িকভাবে হায়েযকে বন্ধ করে দেয়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে এতে কোনো প্রকার অসুবিধা নেই। শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন করা জায়েয আছে। তদ্রূপভাবে রমযানের ত্রিশটি রোযা রমযানের ভিতরেই পালনের উদ্দেশ্যে এমনটি করা জায়েয আছে। তবে চিকিৎসা বিদ্যা অনুযায়ী শরীরের জন্য ক্ষতিকর।–জাদীদ ফিকহী মাসাইল

◆ যদি কারো ব্যবহৃত কুরসুফ (নেপকিন) ভিজে অবস্থায় লাল অথবা হলুদ বর্ণের থাকে; কিন্তু তা শুকিয়ে গেলে সাদা বর্ণের হয়ে যায়। এর উপর হায়েযের হুকুম প্রয়োগ করা হবে। কেননা, ভিজে অবস্থার ধর্তব্য হবে।

◆ হায়েয অবস্থায় চারকুল ও আয়াতুল কুরসী পাঠ করা জায়েয নেই। তবে দুআর নিয়তে জায়েয আছে।

◆ হায়েয অবস্থায় শিক্ষিকা ছাত্রীদের থেকে সবক শুনতে পারবে। এতে শরীয়তের দৃষ্টিতে ছাত্রীদের কোনো গোনাহ্ হবে না।

◆ হায়েয নেফাস অবস্থায় আল্লাহ তাআলার ৯৯টি নাম যপনা করা জায়েয।

◆ হায়েয নেফাস অবস্থায় হাতমুজা পরিধান করে কুরআন শরীফ কিংবা কুরআনী আয়াত সম্বলিত কোনো কাগজ ইত্যাদি ধরা বা বহন করা জায়েয নেই, যদিও মোজা চামড়ার হোক না কেন। কারণ, হাত মোজা হাতের মধ্যেই গণ্য হয়ে থাকে।

◆ হায়েয নেফাসের হালতে যমযমের পানি পান করা যাবে। তেমনিভাবে যে পানিতে আয়াতে কুরআনী অথবা দুআ পড়ে ফুঁক দেয়া হবে, তা পান করা জায়েয।

◆ হায়েয ও নেফাসের হালতে ফেকাহ বা হাদীস গ্রন্থ স্পর্শ করা বা বহন করা মাকরূহ। কেউ কেউ বলেছেন, জায়েয আছে, কিন্তু তা অনুত্তম। তবে উত্তম হল এই যে, রুমাল ইত্যাদি দ্বারা স্পর্শ করা।

◆ হায়েয ও নেফাস অবস্থায় কুরআন শরীফ লিখতে পারবে না। কারণ, কুরআন লেখা, পড়া ও ছোঁয়ার একই হুকুম।

◆ হায়েয অবস্থায় কুরআনের অনুবাদ লেখা মাকরূহ।

◆ হায়েয নেফাস অবস্থায় জায়নামাযে বসে যিকির-আযকার করতে পারবে, তবে খেয়াল রাখতে হবে, জায়নামাযে যেন নাপাক না হয়।

◆ হায়েয অবস্থায় কারো মুখ থেকে সেজদায়ে তেলাওয়াতের আয়াত পাঠ করতে শুনলে, পাঠকারীর জন্য সেজদা ওয়াজিব। কিন্তু শ্রোতার জন্য ওয়াজিব নয়।

◆ হায়েয নেফাস অবস্থায় আযানের জওয়াব দেয়া যাবে।

ইস্তেহাযার পরিচয়

◆ স্ত্রী-লোকের যৌনাঙ্গ থেকে যে রক্ত তিন দিন থেকে কম বা দশ দিনের চেয়ে বেশী অথবা নেফাসের সময় চল্লিশ দিনের চেয়ে বেশী এসে থাকে, আরবী ভাষায় তাকে ইস্তেহাযা বলে।

◆ নয় বছরের পূর্বে কোনো মেয়ের রক্ত এলে, সেটা ইস্তেহাযার হুকুম।

◆ সন্তান পেটে থাকাবস্থায় যদি রক্ত দেখা দেয়, সেটাও ইস্তেহাযা।

◆ সন্তান জন্মের সময় বা জন্মের পূর্বে যে রক্ত বা পানি বের হয়, সেটাও ইস্তেহাযা। অর্থাৎ বাচ্চার অর্ধেক অঙ্গ প্রকাশ পাওয়ার আগ পর্যন্ত যে রক্ত বা পানি বের হয় সেটা ইস্তেহাযা।

ইস্তেহাযার হুকুম ও মাসায়েল

◆ হায়েয নেফাসের ন্যায় ইস্তেহাযা চলাকালিন নামায রোযা মাফ হয় না। নামায রোযা আদায় করতে হয় এবং সহবাস করাও জায়েয। ইস্তেহাযা বন্ধ হলে গোসল করা ওয়াজিব নয়।

◆ ইস্তেহাযা থাকাকালীন প্রত্যেক ফরয নামাযের ওয়াক্তে নতুন ওযু করবে এবং এর দ্বারা ফরয, সুন্নত, নফল ইত্যাদি সর্বপ্রকার নামাজ পড়তে পারবে। ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথে অযুও ভেঙ্গে যাবে।

◆ ইস্তেহাযা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতের নিয়তে অযু করে তিলায়াত ও সে ওয়াক্তের নামায আদায় করা যায়। এ ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথে অযুর বাদ হয়ে যাবে।

◆ ইস্তেহাযা যদি সব সময় না হয়, বরং মাঝে মাঝে হয় আবার মাঝে মাঝে বন্ধ থাকে। তাহলে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে যখন ইস্তেহাযা বন্ধ হবে, তখনই নামাযে দাঁড়িয়ে যাবে। কেননা, ইস্তেহাযা থাকা সত্ত্বেও যখন রক্ত পড়া বন্ধ হয় তখন নামায আদায় করা উত্তম।

◆ ইস্তেহাযা অবস্থায় কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে পারবে। কুরআন শরীফও স্পর্শ করতে পারবে।

◆ এক অযু দ্বারা এক ওয়াক্তের নামায আদায় হবে, একাধিক ওয়াক্তের নয়। তবে এক ওয়াক্তে একাধিক কাযা নামায আদায় করতে পারবে।

গর্ভপাত ও এম আর বিষয়ক মাসায়েল

◆ গর্ভপাত হলে যদি সন্তানের হাত-পা ইত্যাদি তৈরী হয়ে থাকে, তাহলে সেটাকে বাচ্চা ধরা হবে এবং যে রক্ত বের হবে সেটাকে নেফাসের রক্ত বলে বিবেচিত হবে। সন্তানকে দাফন-কাফন দিতে হবে। পক্ষান্তরে যদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকাশ না পয়, তাহলে যে রক্ত বের হয়েছে তা নেফাসের রক্ত বলে গণ্য হবে না। বরং দেখতে হবে ইতিপূর্বে যে হায়েয হয়েছে, তা যদি পনের দিন বা তার চেয়ে বেশী পূর্বে হয়ে থাকে এবং এখনকার রক্ত নিম্নে তিন দিন দীর্ঘায়িত হয়, তাহলে এটা হায়েযের রক্ত বলে গণ্য হবে। আর যদি ইতিপূর্বে হায়েয পনের দিনের কম সময় আগে হয়ে থাকে এবং বর্তমানের রক্ত তিন দিনের কম দীর্ঘায়িত হয়, তাহলে এটা ইস্তেহাযার রক্ত বলে গণ্য করা হবে।

উল্লেখ্য যে, সন্তানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রকাশের পর (যার মেয়াদ ১২০ দিন) গর্ভপাত করানো হারাম।

ধ্বজভঙ্গ পুরুষের পরিচয়

আরবী ভাষায় ধ্বজভঙ্গ পুরুষকে عنين (ইন্নীন) বলা হয়। ধ্বজভঙ্গ রোগের অনেক কারণ থাকলেও এ রোগীর চিকিৎসা সম্ভব। চিকিৎসার মাধ্যমে পূর্ণসুস্থতা লাভ সম্ভব। সকল ধ্বজভঙ্গ রোগীর উচিত অভিজ্ঞ হেকিমদের স্মরণাপন্ন হওয়া।

ধ্বজভঙ্গ রোগ চেনার উপায়

যেসব পুরুষদের বীর্য খুব কম সৃষ্টি হয়। আর যেটুকু সৃষ্টি হয়, তাও আবার পাতলা। মজা স্বাদ অনুভব করা ছাড়াই এমনকি পুরুষাঙ্গ দাঁড়ানো ব্যতীতই বীর্যপাত হয়ে যায়। ক্রমান্বয়ে পুরুষাঙ্গ চিকন ও নিস্তেজ হতে থাকে। ঠাণ্ডা পানির ছোঁয়া পেলে তা সংকোচিত হয় না। কারণ পুরুষাঙ্গ আগে থেকেই সংকোচিত হয়ে আছে। পুরুষাঙ্গ যদি একেবারেই না দাঁড়ায়, শত চেষ্টা করেও যদি দাঁড় করানো সম্ভব না হয় বরং পূর্বের হালতেই থাকে এবং এ হালত দীর্ঘদিন যাবত হয়ে থাকে, তাহলে এরূপ রোগীর চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। কারণ চিকিৎসার দ্বারা তারা সুস্থ হবে না।

পক্ষান্তরে যদি কারো অবস্থা উপরোক্ত হালতের চেয়ে কিছুটা কম হয়ে থাকে, ঠাণ্ডা পানির ছোয়ায় পুরুষাঙ্গ পূর্বের তুলনায় কিছুটা সংকোচিত হয়, তাহলে এসব রোগীর চিকিৎসা সম্ভব। তারা সুস্থ হবে ইনশাআল্লাহ। তাদের উচিত অভিজ্ঞ হেকিম দ্বারা চিকিৎসা করানো।

এ রোগ ভয়ানক কঠিন; এ রোগ যার হয়েছে সব সময় সে চিন্তা ও টেনশনে ভোগে। ধ্বজভঙ্গ হলে সংসার করা তার পক্ষে দুষ্কর হয়ে পড়ে, স্ত্রী সহবাসে ও সন্তানের মুখ দর্শনে বঞ্চিত হতে হয়। পুরুষের পক্ষে ধ্বজভঙ্গ কি কঠিন ও ভয়ঙ্কর রোগ তা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ধ্বজভঙ্গের লক্ষণ-ইন্দ্রিয় শৈথিল্য, পুরুষত্বহীন, স্ত্রী গমনে অক্ষমতা, শরীরের দুর্বলতা হয়। এজন্য এ রোগের তদবীর শুরুতে করতে হয়। রোগ পুরাতন হয়ে পেকে গেলে বহুদিন তদবীর করলে তবে হয় তো ভালো হয়। নতুবা সকল তদবীর নিস্ফল হয়ে যায়। এজন্য ইউনানী হাকিমগণ এ রোগের তদবীর শীঘ্র করতে বলেন। অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস, হস্ত মৈথুন ও বেশ্যাগমনে এসব রোগ হয়ে থাকে।

ধ্বজভঙ্গের প্রাথমিক তদবীর

❖ শতমূলী দুই তোলা, দুধ ষোল তোলা ও পানি চোষট্টি তোলা একত্রে আগুনে জাল দিয়ে ষোল তোলা থাকতেই নামাবে। এক তোলা ঔষধ দুই থেকে তিন চামচ চিনি মিশিয়ে সেবন করবে। এ ঔষধ বছরে একবার ব্যবহার করবে। এটা সেবনে কোনো ইন্দ্রিয় শক্তি দুর্বল হতে পারে।

❖ জিরাকেরমানী, সোওয়াবাকেলা, চিনি পিষে জৈতুন তৈল আর বাবুনার তেলে মিশ্রিত করে মলম তৈরি করবে। এরপর ঐ মলম অল্প আগুনে গরম করে প্রলেপ দিয়ে পট্টি বেঁধে রাখবে।

❖ আনারের পাতা এক তোলা, মেহদির পাতা এক তোলা, নিম পাতা এক তোলা, সোডা এক তোলা, এক সঙ্গে মিশ্রিত করে ফাঁকি করে খাবে।

❖ মাকাল ফলের শাস সাতবার পানিতে ধৌত করে আধা পোয়া আটার সাথে দুই ছটাক চিনি দিয়ে হালুয়া প্রস্তুত করে দৈনিক সকালে এক তোলা পরিমাণ সেবন করবে।

❖ প্রথমে পরিমাণমত একটা পান নিবে। উক্ত পানে খাঁটি ঘি মাখিয়ে আগুনে গরম দিব। পান গরম গরম অবস্থায় লিঙ্গে পেচিয়ে বেঁধে রাখবে এবং সকালে খুলে ফেলবে। কমপক্ষে এভাবে ২১ দিন বাঁধবে এবং সকালে খুলে ফেলবে। এতে অবশ্যই লিঙ্গের উত্তেজনা ফিরে আসবে। এ সময় সকালের ভিজানো ছোলাবুট, মাখন এবং পুস্টিকর খাবার নিয়মিত খাবে।

❖ যে সব আমে বীজ হয় বা আটি হয় নি, এরকম আম ছোট ছোট করে কেটে রোদে শুকিয়ে গুড়ো করে ভালোভাবে ছাকবে। উক্ত গুড়ো এক তোলা পরিমাণ সমপরিমাণ আখের গুড়ের সাথে মিশিয়ে এক সপ্তাহ সকালে খালি পেটে সেবন করলে যাবতীয় ইন্দ্রীয় দোষ ভালো হয়ে যাবে।

❖ দৈনিক একটি করে কবুতরের বাচ্চা, লঙ্কা ছাড়া সামান্য গরম মসল্লা ও লবন মেখে ঘি-এ ভেজে রাতে শয়নকালে ভক্ষণ করবে। ২ থেকে ৩ সপ্তাহ নিয়মিত তা ভক্ষণ করলে ধ্বজভঙ্গ রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হবে।

❖ চল্লিশটি খোরমা ফল দানা ফেলে আধা সের পরিমাণ ঘি-এ ভেজে আধা সের মধুতে ভিজিয়ে একটি কাঁচের বৈয়ামে রাখবে। দৈনিক সকালে ১টা করে ঐ খোরমা খেলে ধ্বংভঙ্গ রোগ আরোগ্য হবে।

❖ আফুলা শিমুল গাছের মূলের ছাল বাতাসে শুকিয়ে চূর্ণ করে ১ ছটাক চূর্ণ করে ১ ছটাক পরিমাণ মধুর সাথে মেখে সমপরিমাণ ১৭টি বটিকা

বানাবে। দৈনিক সকালে ১টি করে বটিকা ঠাণ্ডা পানির সাথে সেবন করলে ধ্বজভঙ্গ রোগ আরোগ্য হবে।

❖ যারা যৌন ক্ষমতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছেন, পুরুষাঙ্গ দুর্বল বা নিস্তেজ হয়ে গেছে। তাদের জন্য একটি চমকপ্রদ ঔষধ হল, একটি পাকা বেল ভাঙ্গার পর ভিতরে কতগুলো লম্বা লম্বা আঠাল কোষ পাওয়া যাবে। আমরা তাকে বিচি বলে জানি। উক্ত বিচি মূল আঠার সাথে সমপরিমাণ পাকা সবরি কলা নিয়ে ভালোভাবে চটকায়ে পুরুষাঙ্গে প্রলেপ দিয়ে একটি পান দিয়ে লিঙ্গ পেচিয়ে দৈনিক দুই ঘণ্টা বেধে রাখবে। এভাবে তিন থেকে চার সপ্তাহ ব্যবহার করলে দুর্বল পুরুষাঙ্গ অতি তাড়াতাড়ি সতেজ ও সবল হয়ে উঠবে।

স্বপ্নদোষ রোগ

স্বপ্নদোষ বলা হয় ঘুমন্ত অবস্থায় বীর্যপাত হওয়াকে। 'একান্ত গোপনীয় কথা' বইয়ে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা ও তার চিকিৎসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আরো কিছু অতিরিক্ত আলোচনা করা হচ্ছে। যেসব কারণে স্বপ্নদোষ দেখা দিতে পারে। যেমন–অশ্লীল চিন্তা-ভাবনা, কু-চিন্তা ফিকির, অশ্লীল স্বপ্ন দেখা, বদ হজম ও পেট খারাপের কারণে। মূত্রথলির দুর্বলতা, বীর্যথলি ভরপুর ইত্যাদি। বীর্যথলি ভরপুর অবস্থায় নতুন বীর্য তৈরী হলে, অতিরিক্ত বীর্য বের হয়ে আসে। বীর্য অতিরিক্ত হয়ে যাওয়ার কারণ ছাড়া বাকিগুলো বীর্যপাতলা বা ধাতু দুর্বলতার কারণে হয়। যার চিকিৎসা আবশ্যক।

স্বপ্নদোষ হওয়ার যতগুলো কারণ রয়েছে, তন্মধ্যে বদ নযর হল অন্যতম। মনের ইচ্ছা নিয়ে কোনো বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, অধিকাংশ সময় স্বপ্নদোষ হয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলার হাজার শোকর যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে [মূল লেখক] বিগত কয়েক বছর যাবত স্বপ্নদোষ থেকে রক্ষা করেছেন। দীর্ঘদিন স্বপ্নদোষ না হওয়াতেও আমি ঘাবরিয়ে গেলাম, না জানি আমার আবার কোন্ রোগ দেখা দিল। এজন্য আমার মুরব্বীদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলাম। তারা আমাকে শান্তনা দিলেন যে, দেখ! স্বপ্নদোষ বেশিরভাগ বদ নযরের কারণে হয়ে থাকে, কারো যদি স্বপ্নদোষ না হয়, তাতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। কিছুদিন পর আমি হযরত আব্দুল কাদির জিলানী রহ. এর রেছালা মুতালাআ করলাম, তাতে লেখা হয়েছে যে, স্বপ্নদোষের উল্লেখযোগ্য কারণ

হল বদ নযর ও বদ খেয়াল। এক তাফসীরে আল্লামা সুয়ুতী রহ. লিখেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ জীবনে কখনো স্বপ্নদোষ হয় নি।

হযরত শায়খ জাকারিয়া রহ. লিখেন, তার জীবনে কেবল একবার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। আর তাও হয়েছিল উটের উপর সাওয়ার অবস্থায়। নবী ও রাসূলগণের স্বপ্নদোষ না হওয়ার করণ হল, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বদ নজর ও বদ খেয়াল থেকে মুক্ত রেখেছেন।

সকল পুরুষের স্বপ্নদোষ হতে হবে এমনটি নয়। বরং কারো সারা জীবনে স্বপ্নদোষ নাও হতে পারে। আবার কারো কারো দেখা যায় যে, মাসে দুএকবার হয়ে থাকে। যদি কারো মাসে দুএকবার স্বপ্নদোষ হয়, তাহলে তাকে হেকিমের স্মরণাপন্ন হতে হবে না। কিন্তু যদি কারো অবস্থা এমন হয় যে, এক মাসে চার পাঁচ বার বা তার চেয়েও বেশি স্বপ্নদোষ হয়, তাহলে তাকে হেকিমের স্মরণাপন্ন হতে হবে।

যদি কারো এভাবে মাসকে মাস বছরকে বছর স্বপ্নদোষ হতে থাকে, তাহলে আস্তে আস্তে তার শরীরে দুর্বলতা দেখা দিবে। অনেক লোক এমনও আছে যে, এক রাতেই তার একাধিকবার স্বপ্নদোষ হয়। এসব লোক একেবারেই দুর্বল হয়ে যায়। ঘুম থেকে উঠলেই মাথা ঘুড়াবে, শরীরে দুর্বলতা অনুভব হবে, চোখে অন্ধকার দেখবে, চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে যাবে, মন ভালো থাকবে না।

অবস্থা এমন হয় যে, বীর্য পাতলা হতে হতে পানির ন্যায় হয়। স্বপ্নদোষ কখন হয়, সে নিজেও জানে না। পেশাব পাখানার সময়ও বীর্যপাত হয়। কোনো সুন্দরী রমনীর সাথে আলাপ করলে, কোনো যৌনবিষয়ক বই পড়লেও বীর্যপাত হয়ে যায়। যখন কারো বীর্য এমন পাতলা হয়ে যাবে, তখন তার দ্বারা সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতা হ্রাস পাবে।

অধিক বীর্যপাত ও মাত্রাতিরিক্ত স্বপ্নদোষের ক্ষতি

বীর্যপাত ও স্বপ্নদোষের আধিক্যতার ক্ষতি যৌবনের সূচনাতে তেমন বুঝা যায় না এবং শরীর তেমন দুর্বলও হয় না। ফলে এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিও নিজের দিকে খেয়াল করে না। মাঝে মাঝে সকাল বেলা তার মাথা ব্যথা করে, মাথা ভারী ভারী মনে হয়। বিশেষ করে বীর্যপাতের পর মাথা হালকা হালকা ব্যাথা অনুভব হয়। যদি কারো এক রাতেই একাধিকবার স্বপ্নদোষ হয়, তাহলে

সে অস্থিরতা ও আত্মভোলা রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেতে থাকে। কোনো রোগের কারণে কেউ এমন অন্ধ হয় না যেমন হয় অধিক বীর্যপাতের কারণে। অধিক স্বপ্নদোষে চোখের দৃষ্টি কমার সাথে সাথে দিল-মনও দুর্বল হয়ে যায়। শরীরে কম্পন রোগ হয়, খাদ্য হজম হয় না। অণ্ডকোষদ্বয় ঝুলা এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ ঢিলা হয়ে যায়। স্মরণশক্তি কম ও মাঝে মাঝে কানে টুনটুনি আওয়াজ হয়।

আবার কারো কারো ঘুম হয় না– এমন রোগী খুব কমই পাওয়া যায়। এ রোগের বেশিরভাগ লোকদের ঘুম বেশি হয়ে থাকে। যখন তারা ঘুমায়, ভয়ানক স্বপ্ন দেখে। এসব লোকেরা পেরেশানীতে ভুগে, চেহারার লাবণ্যতা থাকে না। সাদা চেহারাদারী ব্যক্তিদের চেহারা হরিদ্রাবর্ণ হয়ে যায়। উপরে নিচে উঠানামার সময় হাঁপানো ও সামান্য কাজ করলেই অস্থির হয়ে যায়। বেশি বেশি পেশাব হয়। কারো কারো পেশাবে দুর্গন্ধও প্রকাশ পায়। ভালো ও উত্তম খাওয়ার পরও কোনো উপকার হয় না বরং দিন দিন চিকন হতে থাকে।

যদি কারো মাঝে উপরোক্ত আলামত পাওয়া যায়, নিজেকে বাঁচাতে হলে অতিশীঘ্র তাকে হেকিমদের স্মরণাপন্ন হতে হবে।

স্বপ্নদোষ রোগের বিভিন্ন কারণ

যেসব লোকদের মাঝে স্বপ্নদোষ রোগটি বিদ্যমান, বিভিন্ন কারণে তাদের মাঝে এ রোগটি পাওয়া যায়। যথা—

হস্তমৈথুন, অধিক সহবাস, সমকামিতা, বীর্যের আধিক্যতা, আপত্তিকর মহব্বতের খেয়াল জাগা, চিত হয়ে শয়ন করা, পুরুষাঙ্গ পেটের বরাবর রেখে শয়ন করা, বদ হজম, অধিক খাবার গ্রহণ, পুরুষাঙ্গে চুলকানি রোগ থাকা, পুরুষাঙ্গে চর্মরোগ হওয়া, গোপ্তস্থানের পশম বৃদ্ধি পাওয়া, কারো সাথে কু-সম্পর্ক থাকা, মহব্বত ও ভালোবাসাজনিত দৃশ্যাবলি দর্শন, কিডনি বা মূত্রথলীর দুর্বলতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্বপ্নদোষ রোগের চিকিৎসা

স্বপ্নদোষের ক্ষতির দিকগুলো উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন স্বপ্নদোষ থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে কিছু আলোচনা করা হবে।

❖ স্বপ্নদোষ থেকে মুক্তির পথ ও পদ্ধতির মধ্যে প্রথমটি হল নিজের খেয়াল ও ধ্যান ধারণাকে সব সময় পাক সাফ রাখবে। নিজের মনকে নিজের আয়ত্বে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। সৎ ও ভালো লোকদের সাথে চলাফেরা করবে। এসবের সাথে সাথে খাবার ও পেট ভালো রাখাও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

❖ অধিক মসলাজনিত খাবার, যেসব খাবার বিলম্বে হজম হয়, সেগুলো যথাসম্ভব কম খাবে। যেমন- গোশত, কাবাব, ডিম, অধিক পরিমাণে চা পান, কফি পান, বেগুন, মশুরির ডাল ইত্যাদি।

❖ খাবার দাবার বিশেষ করে রাতের খাবার কমিয়ে দিবে এবং শোয়ার কমপক্ষে দুই ঘণ্টা পূর্বে খাবে। শোয়ার সময় অধিক পরিমাণে পানি ও চা পান করবে না। শোয়ার পূর্বে পেশাব পায়খানার প্রয়োজন সেরে ঘুমাবে। মূত্রথলীতে পেশাব জমা হয়ে স্বপ্নদোষ হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। নরম ও গরম বিছানায় শয়ন করা অনুচিত। বরং এমন ঘরে শোবে, যে ঘরে আলো বাতাশ প্রবেশ করে।

❖ চিত হয়ে শয়ন করাও স্বপ্নদোষ হওয়ার সহায়ক।

❖ শেষ রাতে পেশাবের বেগ হলেই উঠে পেশাব করবে।

❖ গরমকালে রাতে অধিক গরম লাগলে এবং মেজাজও গরম থাকলে যদি গোসল করার দ্বারা কোনো সমস্যা না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে গোসল করে নেওয়া অনেক লাভজনক।

❖ স্বপ্নদোষ প্রতিরোধক ঔষধ বেশি দিন সেবন করবে না। এতেও উল্টা এ্যাকশন হতে পারে। আজীবনের জন্য ধ্বজভঙ্গ রোগ হতে পারে।

❖ স্বপ্নদোষ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি শয়নকালে কখনো লিঙ্গে কোনো প্রকার মলম বা মালিশ ব্যবহার করে শয়ন করবে না। অন্যথায় স্বপ্নদোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

❖ স্বপ্নদোষ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি স্বপ্নদোষের চিকিৎসার পূর্বে হেকিমের নিকট নিজের পেটের হালত বর্ণনা করবে। চিকিৎসা চলাকালিন যৌনচাহিদা বৃদ্ধিকারী কোনো প্রকার খাবার বা ঔষধ ব্যবহার করবে না।

❖ এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি রাতের খাবারে কাঁচা পেঁয়াজ খাবে না। অন্যথায় এ রাতেই স্বপ্নদোষ হবে।

❖ তামাক, বিড়ি, সিগারেটও সেবন করবে না। যদি এসব পান করতে অভ্যস্ত থাকে, তাহলে ধীরে ধীরে তা পরিত্যাগ করবে। কেননা, তামাক

মানুষের দেমাগ ও বীর্যের জন্য অধিক ক্ষতিকর। বিষ যেমন মানুষকে ক্ষতি করে, তামাক মানুষকে তারচেয়েও বেশি ক্ষতি করে। এটা যদি মাত্রায় একটু বেশি সেবন করা হয়, তবেই তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সমস্ত শরীরকে দুর্বল বানানো, মাথা ঘেমে পানি পড়া, মাথা ঘুরা, বমি, চোখে সরিষার ফুল দেখা, দৃষ্টিশক্তি কম, শ্রবণশক্তি হ্রাস, হাত পায়ে জ্বলন, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, হজম শক্তি দুর্বল এমনকি আত্মভোলা হয়ে যায়। হেকিমদের মতে তামাক অধিক পরিমাকে ব্যবহার করলে একসময় মানুষের ফোফরাও নষ্ট হয়ে যায়। দিলে ধুক ধুকানি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ জাতীয় আরো অনেক রোগ দেখা দেয় যা একজন সুস্থ মানুষের জন্য খুবই ক্ষতিকর। অভিজ্ঞদের মতে তামাক গ্রহণকারীদের সন্তানও দুর্বল হয়ে থাকে।

স্বপ্নদোষের চিকিৎসা এভাবে করবে–

❖ কাবাবচিনি ও মকরধজ একসাথে মিশিয়ে চিনি সহযোগে সাতদিন ব্যবহার করলে স্বপ্নদোষ হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

❖ দৈনিক সকালে কবিতরের গম সমান পরিমাণ ইছবগুলের ভূষি সেবন করলে স্বপ্নদোষ হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

❖ সকাল বেলা এক ছটাক ধনিয়া ভালোভাবে কচলে একগ্লাস পানিতে ভিজিয়ে রাতে শয়নকালে উক্ত পানি ছেকে ২ চামচ চিনি দিয়ে শরবতের মতো বানিয়ে পান করবে। এতেও স্বপ্নদোষ হতে মুক্তি পাওয়া যাবে।

❖ আধা তোলা ধনিয়ার গুড়ো ২ চামচ মধুসহ সকালে নিয়মিত সেবন করলে স্বপ্নদোষ হতে মুক্তি পাওয়া যাবে।

❖ রাতে শয়নকালে লিঙ্গে ওলিভয়েল তৈল মালিশ করে শয়ন করলে স্বপ্নদোষ হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

❖ চার আনা পরিমাণ অর্শ্বগন্ধা চূর্ণ করে রাতে ঘুমের কিছুক্ষণ আগে কাচা দুধে মিশিয়ে সেবনের পর ঘুমালে ইনশাআল্লাহ স্বপ্নদোষ হবে না।

❖ শনিবার অথবা মঙ্গলবার রাত্রি বেলা শশ্মানঘাটের ধুতরা গাছের মূল অর্থাৎ শিকড়, কোমরে বেধে রাখলে আর কোনোদিন স্বপ্নদোষ হবে না।

❖ রাতে শোয়ার সময় ভালোভাবে মুখমণ্ডল কান পর্যন্ত, হাত বগল পর্যন্ত এবং পা হাটু পর্যন্ত এমনকি গলাও উত্তমরূপে ধৌত করে ঘুমাবে।

❖ মাত্রাতিরিক্ত চা ও সিগারেট সেবন না করা।

❖ রাতে বেশী পরিমাণ খানা খাওয়া উচিত নয়। অধিক রাত পর্যন্ত

জেগে থাকা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। নিয়মিত আহার ও নিদ্রা যাওয়া উচিত।

❖ জৈতুনের তেল পুরুষাঙ্গ মালিশ করে শয়ন করলে স্বপ্নদোষ হয় না। একখণ্ড শিশা পুরুষাঙ্গের মূলদেশে বেঁধে রাখলেও শুক্রপাত হয় না।

তদ্রুপভাবে দুই তোলা চিনি ভালোভাবে গুড়ো করবে। তারপর সিকি তোলা পরিমাণ আফিম ভালোভাবে মিশিয়ে দুই রত্তি পরিমাণ অর্থাৎ প্রতি তোলায় ৪৮টি করে বড়ি তৈরি করবে। এরপর প্রতি রাতে শয়নকালে একটি করে বড়ি এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানিসহ সেবন করবে। আল্লাহ চাহে তো অচিরেই স্বপ্নদোষ হতে রক্ষা পাবে।

❖ প্রত্যেক দিন ভোর বেলা কৈতরগম কিংবা ইছবগুলের ভূষি এক গ্লাস সরবত বানিয়ে নিয়মিত সেবন করলে স্বপ্নদোষ রোগ ভালো হয়ে যাবে।

অধিক স্বপ্নদোষের কারণে কারো ধাতু বা বীর্য পাতলা হয়ে গেলে নিম্নোক্ত চিকিৎসা গ্রহণ করবে।

❖ সালাম মিছরী ২০০ গ্রাম, শ্বেত মুসরী ১০০ গ্রাম, সকাকুল মিছরী ২০০ গ্রাম, কালো মুসরী ১০০ গ্রাম, সিংঘাড়ের আঠা ৫০ গ্রাম ও চিরিডাল চূর্ণ ৫০ গ্রাম। এগুলো চূর্ণ করে পরিস্কার কাপড়ে ছেকে নিতে হবে। তারপর ঐ চূর্ণগুলো ৩ কিলো গরুর দুধে মিশিয়ে অল্প আঁচে ফুটিয়ে গাঢ় করতে হবে। তারপর ৫০০ গ্রাম গরুর ঘি ও ৭৫০ গ্রাম চিনি মিশিয়ে আরো কিছুক্ষণ আগুনে ফুটাতে হবে। এরপর যখন খুব ঘন বা একটু শক্ত হবে, তখন একটি কাঁচের পাত্রে রেখে দিতে হবে।

যৌনশক্তি বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হল মিসওয়াক করা

যৌন শক্তি বা সেক্স পাওয়ার বৃদ্ধির বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতি 'একান্ত গোপনীয় কথা' বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন একটি আত্মীক ও ঈমানী আলোচনা পেশ করা হচ্ছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত মেসওয়াক করা। মেসওয়াক করার দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টিরই অগণিত উপকার রয়েছে। মেসওয়াকের যতগুলো উপকার রয়েছে, তন্মধ্যে নিম্নে কিছু আলোকপাত করছি।

মেসওয়াক করার দ্বারা সেক্স পাওয়ার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। স্ত্রীর মুখের দুর্ঘন্ধ স্বামীর মনে যৌন চাহিদার মাত্রা যতই থাকুক না কেন, তাকে প্রতিরোধ করে দেয়। এ দুর্গন্ধ বন্ধের অন্যতম উপায় হল মেসওয়াক করা।

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে জানা যায়, মেসওয়াক করার দ্বারা মুখে সুঘ্রাণ সৃষ্টি হয়, মুখ পরিস্কার হয়, দিল দেমাগ শক্তিশালী হয়, অনেক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, মেসওয়াককারী ব্যক্তির সাথে ফেরেশতারা মুসাফাহা করে, যিনা ব্যভিচার থেকে মুক্তির উপায়, দাঁতকে শক্তিশালী বানায়, দাঁতে ঝলক সৃষ্টি করে, দাঁতের মাড়ি মজবুত করে, কাশ বের করে দেয়, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, মেসওয়াকে অভ্যস্ত ব্যক্তির রুজি রোজগার করা সহজলভ্য হয়ে যায়, অনেক দেরিতে বৃদ্ধপনা দেখা দেয়, কোমর মজবুত ও শক্তিশালী বানায় ইত্যাদি।

মেসওয়াক বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার [অনুবাদক] রচনা 'মাসায়িলুন নিসা' কিতাব দেখা যেতে পারে।

যিনা ব্যভিচারের ক্ষতি

যিনা ব্যভিচার সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করলেও এখানে যিনা ব্যভিচার মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার ক্ষতির দিকটি উল্লেখ করা হচ্ছে, কারণ বিষয়টি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, বর্তমানে লোকজনে যিনা ব্যভিচার করে নিজেকে বড় মনে করে লোকসমাজে নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করছে। আবার অনেকে যিনার ক্ষেত্রে সেঞ্চুরি করে মিষ্টিও বিতরণ করছে। অথচ এ আকাশ যমীনের সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আলামীন যিনা সম্পর্কে হুশিয়ার বাণী করেছেন এভাবে–

ولا تقربوا الزناء انه كان فاحشة وساء سبيلا

"তোমরা যিনা ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হইও না। কেননা, এটা বড়ই বেহায়াপনা ও নির্লজ্জ কাজ"।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলেন, তাওরাত কিতাবে আছে 'যিনা ব্যভিচার করিও না, যদি তোমরা যিনা ব্যভিচার করো, তাহলে মনে রাখবে তোমাদের স্ত্রীও যিনা করবে।'

যিনাকারী ব্যক্তি যিনা করে যেখানে গোসল করে, সে যমিনও তার জন্য বদ দোআ করতে থাকে। যিনার দ্বারা যদিও দুনিয়ায় মজা অনুভব হয় কিন্তু আখেরাতে রয়েছে এর জন্য কঠিন থেকে কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। যিনার আগুন ঈমানকে জ্বালিয়ে দেয়। যিনাকারীর খারাবতার প্রভাব তার প্রতিবেশীর উপরও বর্তায়। যদি প্রতিবেশীরা যিনাকারীকে খারাপ জ্ঞান না করে।

যেখানে যিনা ব্যভিচার হয়, সেখানে খোদা প্রদত্ত বালা-মুছিবত নাযিল হতে থাকে। ভূমিকম্প দেখা দেয়। যিনাকারী ব্যক্তি বড়ই দুঃখ-কষ্টের জীবন যাপন করে।

আরবীতে একটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে–

الزناء يخرب البناء

"যিনা ব্যভিচার প্রত্যেক ভিত্তিকে নির্মূল করে দেয়"।

পক্ষান্তরে যিনা ব্যভিচার থেকে যারা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে, তাদের সম্পর্কে হাদীসে এসেছে- কিয়ামতের দিন যখন কেউ আশ্রয় নেওয়ার মতো কোনো স্থান পাবে না, সকলে সামান্য আশ্রয় নিতে জায়গা খুঁজবে, তখন আল্লাহ তাআলা যিনা থেকে বাঁচনেওয়ালাদেরকে স্বীয় আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। যিনা ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকা জান্নাত পাওয়ার অন্যতম উপায়।

হাদীসে এসেছে, তিন ব্যক্তিকে যদি জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়, তবুও জাহান্নাম তাদেরকে জ্বালাবে না। তন্মধ্যে একজন হল, যে ব্যক্তি সব সময় কুরআনুল কারীম তেলায়াত করত। দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তি মেহমানের কদর করত এবং তৃতীয় হল ঐ ব্যক্তি, যিনা ব্যভিচারের মহা সুযোগ আসার পরও যে নিজেকে বিরত রেখেছে।

যিনা ব্যভিচারের বিশেষ ছয়টি ক্ষতি

১। যিনাকারীর চেহারার রৌনক্ব বা উজ্জ্বলতা, শোভা, সৌন্দর্য বা বাহার শেষ হয়ে যায়।

২। রোজি রোজগারে বরকত কমে যায়। যে কাজই করুক না কেন, কোনো কাজেই বরকত হয় না।

৩। হায়াত কমে যায়। হায়াতে বরকত হয় না। অর্থাৎ হায়াত পাওয়ার পরও যথেষ্ট পরিমান ছাওয়াবের কাজ করতে পারে না।

৪। আল্লাহর আযাব-গজবে নিপতিত হয়। বালা-মছিবত সর্বদা লেগেই থাকে। একটার পর একটা সমস্যা লেগেই থাকে।

৫। হাশরের ময়দানে হিসাব নিকাশে কঠোরতা করা হবে।

৬। দীর্ঘকাল জাহান্নামে পড়ে থাকতে হবে।

বলা হয়েছে, যিনাকারীর কবরের দিকে আগুনের বিশ লাখ দরজা খুলে দেওয়া হবে। প্রত্যেক দরজার সাথে সাপ, বিচ্ছু আসবে এবং তাকে দংশন

করতে থাকবে। এ অবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। আরো বলা হয়, যে বৎসরে যিনা করেছে, সে বৎসরের আমল বাদ হয়ে যাবে, জাহান্নামের মধ্যে বিশেষ একটি কুপ রয়েছে, যেখানে কেবল যিনাকারীদেরকেই নিক্ষেপ করা হবে। আর সে কুপের আগুনের শাস্তি এতো কঠিন হবে, যদি সে কুপের মুখ খুলে দেওয়া হয়, তাহলে সে আগুনে সারা জাহান্নামবাসি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এমনও বলা হয় যে, যদি সে কুপের সামান্যতম আগুন অন্যান্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে সেসব জাহান্নামবাসীরা জ্বলে পুড়ে যাবে। এই কঠিন কোপে কেবল যিনাকারী, সুদখোর, পিতা-মাতার নাফরমান বান্দারা শাস্তিভোগ করতে থাকবে।

যিনা করার পর যখন সে গোসল করে এবং তার গোসলের এক ফোটা পানি মাটিতে পড়ে, তখন যমীন আল্লাহর দরবারে এ বলে ফরিয়াদ জানায়, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হুকুম করো যেন আমি এ যিনাকারীকে আমার ভূগর্ভে নিয়ে আসি। তখন আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তুমি শান্ত হও, সবর কর। এক সময় তোমার কাছেই আসবে। যিনাকারী ব্যক্তি যিনা করার সময় মুমিন থাকে না। বনি ইসরাইলের ৭০ হাজার লোক এই যিনার কারণেই আচানক মছিবতাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল।

যিনা নামক এ হীন কাজটি মানুষের আত্মিক ও ঈমানী শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়। সমস্ত নেক খাছলত ও সৎ স্বভাবগুলো ধীরে ধীরে মুছে দেয়। কুদরতী ভাবেই যিনাকারীর সুনাম-সুখ্যাতি, মান-ইজ্জত ও সম্মান বিলীন হতে থাকে। নেককার মহিলারা যিনাকারীকে যথেষ্ট ভয় পায়। যিনা করার কারণে সকল সৎ কাজ করার সাহস হারিয়ে যায়। চেহারা ফেকাশে হয়ে যায়। রোজি রোজগার ও কামাইয়ে বরকত থাকে না।

যিনা ব্যভিচার এমনই একটি খারাপ কাজ, যা পৃথিবীর কোনো মাজহাব এমনকি কোনো ধর্মই স্বীকৃতি দেয় নি। সব ধর্মেই যিনা ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যিনাকারীর শাস্তি সব ধর্মেই রয়েছে। কুরআনুল কারিমের ১৮ পারার সুরা 'নুর' -এ যিনাকারীর শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে।

দুনিয়াতে যিনার মজায় এমন ক্ষতিকর দিক রয়েছে, যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। দেখা গেছে, অনেক বিত্তবান ব্যক্তিরা যিনার কাজে লিপ্ত হওয়ায় একপর্যায়ে তারা রাস্তার ফকীর হয়ে গেছে। নিজের কষ্টে অর্জিত অর্থ সম্পদ যিনা করতে গিয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে। অবশেষে আল্লাহর নিকট

অপরাধী বান্দা হিসেবে গণ্য হয়েছে এবং দুনিয়ার লোকজনের নিকটও ঘৃণ্য লোক হিসেবে গণ্য হয়েছে।

দুনিয়ার এ স্বাদ ও মজা ক্ষণিকের জন্য। এ স্বাদ ও মজা একদিন ছাড়তেই হবে, আজীবন ধরে রাখা যাবে না। দুনিয়াতে জীবিত থাকাবস্থায় বৃদ্ধ হলে এমনি এমনিই বাদ পড়ে যাবে। যৌবন বয়সের বাহাদুরী ক্ষণিকের জন্য। বৃদ্ধ বয়সে এ বাহাদুরী আর থাকবে না। সুতরাং এখন থেকেই নিজেদেরকে সংযত করে পরকালের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে ।

আল্লাহর দরবারে দুআ করি, তিনি যেন এ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে সঠিক বুঝ দান করেন, তাদেরকে এ হীন কাজ থেকে বিরত থাকার তাওফীক দেন। যিনার লিপ্ত ব্যক্তিরা নিম্নোক্ত দুআটি বেশি বেশি পড়বে–

اللهم انی اعوذ بك من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی

ومن شر قلبی ومن شر منی

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার কান দ্বারা খারাপ কথা শ্রবণ করা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি এবং আমার দৃষ্টিশক্তির খারাবতা, আমার যবানের খারাবতা, আমার কলবের খারাবতা ও বীর্যের খারাবতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।"

উক্ত দুআটি হাদীস শরীফ থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি প্রত্যেক নামাযের শেষে তিনবার করে পড়বে।

সমকামিতা বিষয়ক কিছু কথা

লাওয়াত্বাত তথা পুরুষের সাথে মনোবাসনা পুরণকারী ব্যক্তি যদি দুনিয়ার সব পানি দিয়েও গোসল করে, তারপরও কিয়ামত দিবসে সে অপবিত্র অবস্থায় উঠবে। এ পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হল, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দরবারে তওবা করা। কেবল তওবা-ই এ পাপকে মুছে দিতে পারে। যে ব্যক্তি কোনো বাচ্চাকে মনের খাহেশ নিয়ে আদর করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে হাজার বছর জাহান্নামে ফেলে রাখবেন।

শয়তান কাউকে কোনো বাচ্চার সাথে অপকর্ম করতে দেখে, সেখান থেকে আল্লাহর আজাবের ভয়ে দ্রুত পলায়ন করে। এ পাপকর্ম চলাকালে আল্লাহর আরশ কাঁপতে থাকে। কামভাবের সাথে বাচ্চাকে চুমা দেওয়া মায়ের সাথে যিনা করার মতো। মায়ের সাথে যিনা নবীদেরকে হত্যা করার নামান্তর।

হযরত সুলাইমান আ. একদা এক শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেন- তোমার দৃষ্টিতে কোন আমলটি উত্তম? জবাবে শয়তান বলল, লাওয়াত্বাত বা সমকামিতা। শয়তান আরো বলল, একজন মহিলা যখন অপর আরেকজন মহিলার সাথে এমন অপকর্মে লিপ্ত হয়, তখন আমি অনেক খুশি হই।

লাওয়াত্বাত তথা সমকামিতা এই পাপ কাজের জন্যই আল্লাহ তাআলা হযরত লুত আ.এর জাতিকে নির্মূল করে দেন। যমীন উল্টিয়ে দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেন। তাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

যেসব লোক সমকামিতা করে বা স্বীয় স্ত্রীর গোপ্তস্থানের পরিবর্তে পেছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করে, তাদের সম্পর্কে হযরত আলী রা. বলেন- এসব লোকদেরকে হত্যা করে আগুনে জালিয়ে দেওয়া দরকার। হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ. অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তাদেরকে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করে পাথরাঘাত করে মেরে ফেলা দরকার। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে 'একান্ত গোপনীয় কথা' কিতাবটি পড়া যেতে পারে।

হস্তমৈথুন বিষয়ক কিছু কথা

হস্তমৈথুন অর্থাৎ হাত দ্বারা যৌনাঙ্গ হতে বীর্যপাত ঘটানো, যাকে জ্বলক বলা হয়। এ বিষয়ে 'একান্ত গোপনীয় কথা' কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কেবল এ বিষয়ে আরো জরুরি কিছু কথা আলোকপাত করা হবে।

হস্তমৈথুন এটি খুবই বদ অভ্যাস। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলেন, হস্তমৈথুনের মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটানো হারাম। বর্তমানে এটা এমনই একটি জঘন্য মছিবত হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সারা বিশ্বেই এই অপকর্মটি বিরাজমান। পৃথিবীর এমন কোনো দেশ পাওয়া যাবে না যে দেশে এ হীন কাজটি হচ্ছে না। আর এ হীন কাজের দরুণ অনেক লোক ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এটা মাত্রাতিরিক্ত সহবাসের চেয়ে ক্ষতিকর। হস্তমৈথুনের ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া সারা শরীরে বিস্তার করে। সাথে সাথে ক্ষতিকারক অনেক রোগও দেখা দেয়। বিশেষ করে, অন্তর, মস্তিষ্ক, যৌনাঙ্গ একেবারে বিকল হয়ে যায়। যে ব্যাক্তির এ বিশেষ অঙ্গটি দুর্বল ও বাদ পড়ে যাবে, তার জীবনের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। এমন ক্ষতি, শত আফসোস করেও তা আর পূর্বাবস্থায় আনা যায় না। এ খারাপ অভ্যাসটি সব বয়সেই হতে পারে। আর যে ব্যক্তি এ অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তারা এটি করা ছাড়া থাকতে পারে না।

এ বদঅভ্যাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের যেসব সমস্যা দেখা দেয় তন্মধ্যে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হল।

মাথা ব্যাথা, মস্তিষ্কের ব্যাথা, কোমরে ব্যাথা, পায়ে ব্যাথা করে। মাথা চক্কর মারে। এমনকি যে কোনো বিষয়ে সে সন্দিহান হয়ে যায়। শরীর এমন দুর্বল হয়ে যায় যে, হাটুর উপর ভর দেয়া ব্যতিত দাঁড়াতে পারে না। কোমরের ব্যাথায় বসতে পারে না। শুতে গেলে পাঁজর ব্যাথা করে। অনেক সময় চলাফেরা করার সময় অনিচ্ছায় পেশাব বের হয়ে যায়। মাঝে মাঝে উঠ-বস করতেও বীর্যপাত হয়ে যায়। দিন-রাতে স্বপ্নদোষের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তার বীর্য এত পাতলা হয়ে যায় যে, কখন তার বীর্যপাত হল সে সময়টিও তার জানা থাকে না।

এছাড়াও পেশাব বা পানির মতো বীর্য পাতলা হয়ে যায়। বীর্যের কীট শেষ হয়ে যায়। যে কারণে ভবিষ্যতে সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেতে থাকে। দিল দেমাগ সঠিকভাবে কাজ করে না। অনেকে পাগল হয়ে যায়। অনেকের দিন কাঁপে। পুরুষাঙ্গ বক্র হয়ে একদিকে হেলে পড়ে। যৌনাঙ্গের শিরা বা রগ দুর্বল হয়ে যায়। ধ্বজভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা বেশি। সাহস হারিয়ে ফেলে। সব সময়ই চিন্তা ও টেনশন কাজ করে। এ রোগটি যে কতো মারাত্মক কেবল সেই বুঝে যে এ রোগে আক্রান্ত। যেমন কবরের অবস্থা মৃত ব্যক্তিই বুঝতে পারে। এজন্যই হাকীমগণ বলে থাকেন, হস্তমৈথুন করা যিনা ব্যভিচার করার চেয়েও অধিক ক্ষতিকারক।

কারো মাঝে এ রোগটি দেখা দিলে যতদ্রুত সম্ভব আরোগ্যের ব্যবস্থা নিতে হবে। অনেক পিতা-মাতা তার ছেলের এ ব্যাপারে বেখেয়াল থাকে। তাদেরকেও এ বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হওয়া আবশ্যক।

জরুরি হেদায়াত

আল্লাহ তাআলা মহিলাদের গোপ্তস্থানকে এজন্য পর্দাদার বানিয়েছেন, সহবাসের সময় পুরুষাঙ্গ মোটা ও ফুলে যায়, তথাপিও তারা যেন পুরুষাঙ্গ তাদের গোপ্তস্থানে প্রবেশ ও বের করার সময় কোনো প্রকার কষ্ট অনুভব না করে। এবং তাদের পুরুষাঙ্গ কোনো প্রকার চাপের সম্মুখিন না হয়।

প্রক্ষান্তরে পুরুষদের পেছনের রাস্তা খোলামেলা। তার ভেতরের পথ সামান্য প্রশস্ত। সে রাস্তা দিয়ে যদি [মোটা ও ফোলা অবস্থায়] পুরুষাঙ্গ প্রবেশ

করে, তাহলে অবশ্যই পুরুষাঙ্গ চাপের সম্মুখিন হবে। আর পুরুষাঙ্গ যখন চাপের সম্মুখিন হবে এর দ্বারা পুরুষাঙ্গ নিস্তেজ ও চিকন হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভবনা রয়েছে। আর যদি একবার কারো পুরুষাঙ্গ নিস্তেজ ও চিকন হয়ে যায়, তাহলে তাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে অনেক কষ্ট ও মেহনতের প্রয়োজন। অনেকেই এ রোগে আক্রান্ত থাকতে থাকতে নিজের লিঙ্গকে এমন চিকন বানিয়ে ফেলেছে যে, শত চিকিৎসা ও চেষ্টা করেও কোনো ফল পায় নি। অনেকেই ধ্বজভঙ্গ হয়ে গেছে।

মহিলাদের সম্মুখের রাস্তা দিয়ে সহবাস করাটা স্বাভাবিক নিয়ম। আল্লাহ তাআলা এ রাস্তাকে এ কাজের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এ পথে সহবাস করার দ্বারা দৈনিক তার যৌনশক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। পক্ষান্তরে পেছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করার মাঝে এ ধরণের কোনো প্রকার উপকারিতা নেই। বরং ক্ষতি আর ক্ষতিই। আমাদের ধর্মে এ পথে সহবাস করাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম বলা হয়েছে। সরকারি আইনেও অনেক বড় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ধরনের হীন কাজের জন্য আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর দুনিয়াতে যে শাস্তি দেওয়া হবে তা কেবল বোনাস হিসেবে। এ পথে সহবাস করার দ্বারা অপমান ও অপদস্থ ছাড়া আর কি আছে। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সর্বদা চিন্তা ও পেরেশানীতে ভোগে। আজীবনের জন্য সন্তান জন্ম দেয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। আল্লাহ তাআলা এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে খাছ তওবা করার তাওফীক দান করুন।

মহিলাদের সমকামিতা

পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের মাঝেও সমকামিতা নামক বদঅভ্যাস পরিলক্ষিত হয়। যুবতী নারীরা যৌন উত্তেজক আলোচনা শোনার দ্বারা বা যৌন উত্তেজক ছবি দেখার দ্বারা এ কাজের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে। তদ্রুপভাবে এ জাতীয় বাজে কার্যাবলী টিভি'র বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচার করা হয়ে থাকে। ফলে যুবতী নারী বা বিধবা নারীরা সেসব চিত্র দেখার কারণে নিজেদের মাঝেও ঐ কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

যেসব মহিলাদের স্বামী কাছে থাকে না বা বিদেশে থাকে কিংবা যেসব মহিলারা স্বীয় স্বামী দ্বারা তৃপ্ত হয় না, তাদের মধ্যে অনেকেই ঐ হীন কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। পূর্বকার যুগের মহিলাদের মাঝে এ বদ অভ্যাস ছিল, যখন

কোনো নারী নিজের যৌন চাহিদা পূরণের কোনো স্থান না পেতো, তখন তাদের মতো আরো অনেক নারীরা পরস্পরে সমকামিতায় লিপ্ত হতো। সে সময়কার সমকামিতার ধরণ ছিলো- তারা নিজেদের গোপ্তস্থানে পরিমাপ অনুযায়ী চামড়া বা রেশমের কাপড় দ্বারা পুরুষাঙ্গের ন্যায় লিঙ্গ বানাতো। সে লিঙ্গে তুলা বা নরম জাতীয় কোনো কিছু ভরে দিয়ে খুব মজবুত আকারে তা মোটা ও লম্বা বানাত। এরপর সেটাকে অপর মহিলার কোমরে বেঁধে দিয়ে পুরুষের ন্যায় সহবাস বা সমকামিতা করতো। বর্তমানেও এ ধরণের বিভিন্ন উপায় উপকরণ পাওয়া যায়।

এ জাতীয় বাজে অভ্যাসে অভ্যস্থ মহিলারাও পুরুষদের ন্যায় সমকামিতার বিভিন্ন বালা-মছিবতে আক্রান্ত হয়। তারা কোনো পুরুষের সাথে সহবাস করে তৃপ্তি পায় না। পুরুষের সাথে সহবাসে তারা কোনো প্রকার আনন্দ অনুভব করে না। এসব নারীরা সন্তান ধারণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। এ বদঅভ্যাসে আক্রান্ত নারীদের চিকিৎসা খুবই দুষ্কর।

সমকামি নারীদেরকে চেনার উপায়

সমকামি নারীদেরকে চেনার উপায় এজন্য লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে, যেন তাদের গার্জিয়ানরা তাদেরকে সংশোধন করতে পারেন। তাদের হিতাকাঙ্খী হয়ে তাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে পারেন। এতে উভয়ের জন্য রয়েছে অফুরন্ত কল্যাণ। এ বিষয়ে লিখে তাদেরকে অপদস্থ করা উদ্দেশ্য নয়। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি কারো দোষ গোপন করবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা তার দোষ গোপন করবেন।

সমকামি নারীদেরকে চেনার উপায় হল– তাদের মেজায থাকবে তিক্ত, সামান্যতেই রেগে যাবে। সব সময় তাদের নাকের উপর রাগের চিহ্ন ফুটে থাকবে, চেহারা থাকবে কুঞ্চিত, চোখের নিচে কালো দাগ, চেহারা ফেকাশে, চেহারার মাঝে খারাবতার চাপ ফুটে উঠবে, চেহারা সব সময় শুকনো শুকনো মনে হবে, চেহারার ঔজ্জ্বলতা নিস্তেজ এবং চোখদ্বয় কোঠরাগত হবে, চোখের চারপাশে চিন্তা ও টেনশনের ছাপ প্রস্ফুটিত হবে। এসব নারীদের সবসময় মাথা ব্যাথা থাকে, কথার আওয়াজে কোনো ভারত্বভাব থাকবে না। মাথার চুল অতি অল্প বয়সেই ঝরতে থাকবে। অতি অল্প বয়সেই চুল সাদা হতে থাকবে। ক্ষুধা হ্রাস পাবে। আবার যা খাবে, তাও সহজে হজম হবে না। সব সময় দিল

ধরফর করতে থাকবে। আবার অনেকের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। আবার যদি ঋতুস্রাব আসেও তবু তা পরিমাণে একেবারেই সামান্য। ঋতুস্রাবের রক্ত থাকবে কালো রঙয়ের দিকে ধাবমান এবং তা হবে খুবই দুর্গন্ধযুক্ত।

পিঠ ও রানেও ব্যাথা অনুভব হবে। জরায়ুর ভিতরে এবং লজ্জাস্থানের বহিরাংশ ফুলে যাবে। জরায়ু থেকে ক্রমাগত রক্ত পরতেই থাকবে। লজ্জাস্থানে জ্বলন রোগ দেখা দিতে পারে।

সমকামিতা রোগ থেকে বাঁচানোর তদবীর

সমকামিতা এমন একটি মারাত্মক বদ অভ্যাস যা ধন-সম্পদ, আমল-আখলাক, সৌন্দর্য এমনকি ঈমানের জন্য অপূরণীয় ক্ষতিদায়ক। এজন্য প্রত্যেক পিতা-মাতা ও গার্জিয়ানকে স্বীয় বাচ্চাদের ছোটবেলা থেকেই আখলাক গড়ার প্রতি যথেষ্ট যত্নবান হতে হবে। সর্বদা তাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যেন, তারা কোনোক্রমেই এ জাতীয় হীন অভ্যাসে লিপ্ত হতে না পারে। এসব বিষয়টি যেন তারা বুঝতেও না পারে। ছোট থেকে ছোট বিষয়ের ক্ষেত্রেও কড়া নযর রাখবে। যেসব ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে গেছে তাদের নিজেদেরকেই উত্তম আখলাক গড়তে হবে। যাবতীয় বদ অভ্যাস থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। কোনোক্রমেই বদ অভ্যাসে লিপ্ত করা যাবে না।

যদি কেউ ঘটনাক্রমে এসব বদ অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে তাকে অতি দ্রুত সেসব ত্যাগ করতে হবে। যেসব সন্তানদের মাঝে এসব লক্ষণ দেখা দিবে, গার্জিয়ানদের উচিত অতি তাড়াতাড়ি তার সংশোধনের ব্যবস্থা করা। যেমন কোনো সন্তানের মাঝে পিতা-মাতা দেখতে পেল যে, তাদের সন্তানের চোখের পুতলি স্বাভাবিক না থেকে তুলনামুলক ফুলা বা বড় বড় হয়ে গেছে। কথা বলার সময় তার দৃষ্টি পায়ের দিকে থাকে। কথা বলার আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। উচ্চ আওয়াজে কথা বলতে পারছে না। চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে যাচ্ছে। তার চেহারা আকার আকৃতি ভয়ানক হয়ে যাচ্ছে। চেহারা ফেকাশে হয়ে যাচ্ছে, বদ মজাযী, চোখের দৃষ্টি কমে যাচ্ছে, অলস হয়ে যাচ্ছে, সব সময় ভিত থাকে। ইত্যাদী হাব ভাব যখন দেখবে, তখনই সন্তানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দিতে থাকবে। যদি সত্যি সত্যি সন্তান বাজে অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে থাকে, তাহলে তড়িৎ সংশোধন করতে হবে। অন্যথায়

এক পর্যায়ে সন্তান সমকামিতা, হস্তমৈথুন বা এর চেয়েও মারাত্মক কাজে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। অল্প বয়সেই নিজের মৌলিক বস্তু হারিয়ে ফেলবে। যখন বুঝে আসবে, তখন হয়ত শত চেষ্টা করেও পূর্বের ন্যায় সুস্থ হতে পারবে না। আজীবন তাকে এ গ্লানী নিয়ে জীবন যাপন করতে হবে।

বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি হাদীস

বিবাহ মানব জীবনে খুবই জরুরি জিনিস। বিবাহ করতে যে ব্যক্তি কোনো সমস্যা নেই তার অবিবাহিত জীবন কাটানো অনুচিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ সম্পর্কে অনেক হাদীস বলেছেন, তন্মধ্যে কিছু হাদীস নিম্নে উল্লেখ করলাম।

১। 'মুহতাজ ও অসহায় সে ব্যক্তি যার স্ত্রী নেই। তদ্রূপভাবে মুহতাজ ও অসহায় সে নারী, যার স্বামী নেই। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি তারা অর্থ-সম্পদে বিত্তবান হয়, তাহলেও কি তারা অসহায়? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বললেন, হ্যাঁ তারা যতো সম্পদের অধিকারী হোক না কেন, তারা অসহায়।' আসলে এ হাদীসে বিবাহহীন জীবনকে অসহায় জীবন বলার কারণ হল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের মাঝে বিবাহ প্রথা চালু করেছেন কেবল মানুষদের আরাম ও শান্তি পাওয়ার জন্য। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন–

وجعل منها زوجها ليسكن اليها

"আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জোড়া জোড় করে বানিয়েছেন যেন আমরা শান্তিবোধ করি।"

২। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলেন, স্বামী স্ত্রী একে অপরের প্রতি যখন মহব্বত ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে, তখন আল্লাহ তাআলা স্বীয় রহমতের দৃষ্টিতে তাদেরকে দেখতে থাকেন।

৩। বিবাহ ঈমানের অর্ধেক। অর্থাৎ বিবাহের মাধ্যমে ঈমান পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। সেহেতু বলা যায় যে, যদি কারো ঈমান অপূর্ণাঙ্গ থাকে, তাহলে তার আমলে ছাওয়াব কম হওয়াটাই স্বাভাবিক।

৪। যখন কোনো স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে চুমা দেয়, তখন তাকে প্রত্যেক চুম্বনের বিনিময়ে হাজার বছর ইবাদতের ছাওয়াব দান করা হয়। যখন গলার সাথে গলা মিলায় তখন তাকে দুহাজার বছর ইবাদতের ছাওয়াব দান করা

হয়। যখন সহবাস করে, তখন তাকে তিনহাজার বছর ইবাদত করার সমান ছাওয়াব দান করা হয়। এরপর যখন [সহবাসের পর ফরয] গোসল করে তখন তাকে চার হাজার বছর ইবাদত করার সমপরিমান ছওয়াব দান করা হয়।

৫। স্ত্রী যখন আপন স্বামীকে দেখানোর উদ্দেশ্যে সাজ-সজ্জা গ্রহণ করে, তখন তাকে দুহাজার বছর ইবাদত করার সমপরিমাণ ছাওয়াব দান করা হয়। প্রক্ষান্তরে যে স্ত্রী স্বীয় স্বামীর বিনা অনুমতিতে ঘরের বাইরে যাবে, আকাশ যমীন ও ফেরেশতা তার উপর অভিশাপ দিতে থাকে যতক্ষণ না সে স্বামীর ঘরে প্রত্যাবর্তন করে। আর যে মহিলা স্বামী ব্যতিত অন্যান্য পরপুরুষদেরকে নিজের শরীর দেখাবে, পরপুরুষদের প্রত্যেক দৃষ্টিতে মহিলার উপর ৩৬০টি অভিশাপ নাযিল হবে।

৬। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমর মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যখন তোমরা স্বীয় স্বামীর দ্বারা গর্ভবতী হবে এবং স্বামীও তোমাদের উপর সন্তুষ্ট, তখন তোমাদেরকে দিনে রোযা রাখা ও রাতে ইবাদত করার সমপরিমাণ ছাওয়াব দান করা হবে। যখন সন্তান ভূমিষ্টের কাছাকাছি সময় হয়ে আসবে, তখন তার জন্য জান্নাতে চক্ষু শীতলকারী জিনিসপত্র প্রস্তুত করা হয়। যখন বাচ্চাকে বুকের দুধ পান করানো হবে প্রতি গ্রাসের বিনিময়ে একটি করে নেকি দান করা হবে। বাচ্চার কারণে রাত জাগতে হলে এর বিনিময়ে সত্তরটি গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ ছাওয়াব দান করা হবে। এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে, শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। –ইবনে মাযাহ

সুখের সংসার গড়তে স্বামী স্ত্রীর দায় দায়িত্ব

বর্তমানে অনেক স্বামী স্ত্রীর মাঝে মিল মহব্বত পাওয়াই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। যে কারণে সংসারে অশান্তি নেমেই আছে। খুব কম সংসারই পাওয়া যাবে, যারা বেশ সুখে আছে। এজন্য প্রত্যেক মহিলার উচিত স্বীয় স্বামীকে মন প্রাণ উজার করে ভালোবাসা। স্বামীর উচিত স্ত্রী যদি কখনো কিছুটা উলট পালট করে ফেলে তখন তাকে সংশোধন করা নিজে সবর করা। স্বামী যখন বাড়িতে আসবে, তখন হাসি খুশি মুখে স্বামীকে স্বাগতম জানিয়ে বরণ করা। অযুর হালতে খাবারা রান্না করবে। সব সময় স্বামীর সাথে বসে একই দস্তরখানে খাবার খাবে।

সকলেই বিবাহের পূর্বে জল্পনা কল্পনা করে যে, আমার সংসার হবে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী সংসার। দুনিয়াতেই আমি স্বর্গের সুখ অনুভব করব। আমার সংসার হয়ে থাকবে সকলের জন্য উপমাতুল্য। আমার উপমা দিয়ে অন্যান্য লোকেরা নিজেদের সংসার গুছাবে। কিন্তু বিবাহের পর তার জল্পনা কল্পনা একেবারে মাটির সাথে মিশে যায়। স্বর্গের সুখ তো দুরের কথা দুনিয়ার মাঝে তার চেয়ে দুঃখ কষ্টের জীবন আর কারো আছে বলে মনে হয় না। তখন তার এ খেয়াল আসে যে, আসলে বিবাহের জীবন খুবই কষ্টদায়ক। বিবাহের পূর্বেই ভালো ছিলাম। বিবাহ কেন করলাম। একাকী জীবনই দুনিয়ার জন্য স্বর্গীয় জীবন। আসলে তার এসব চিন্তা-ভাবনা সবই ভুল। তার জীবনে কেন এসব দুর্ভোগ নেমে এল, সে বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং তা সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। নিম্নে দাম্পত্য জীবনে কেন অশান্তি নেমে আসে এবং তার প্রতিকার কি, সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হল।

সাংসারিক জীবনে কলহের কারণ

১. স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অথবা যে কোনো একজন দীনের ব্যাপারে উদাসীন হলে।

২. স্ত্রী চলাফেরায় বেপরোয়া ও সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা থাকলে।

৩. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কারো কোনো কু-অভ্যাস থাকলে।

৪. স্বামী-স্ত্রীর কারো অতীত জীবনে কোনো কলঙ্কময় বিষয় থাকলে।

৫. স্বামী-স্ত্রী দীর্ঘদিন আলাদা অবস্থান করলে।

৬. স্বামীর ছোটখাটো প্রয়োজনের গুরুত্ব না দিলে।

৭. স্ত্রীর অনুরোধ বা আবদার না রাখলে।

৮. স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সামঞ্জস্যতা না থাকলে।

৯. স্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে ধনী এবং স্বামীর সম্পদ কম হলে।

১০. স্ত্রী শালীনতা ও পর্দার প্রতি অমনোযোগী হলে।

১০. স্ত্রী নিজ বাপ-ভাইয়ের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগী এবং শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি অমনোযোগী হলে।

১১. স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে শিক্ষার সামঞ্জস্যতা না থাকলে।

১২. স্ত্রী পরপুরুষ এবং স্বামী পরনারীর সাথে অবাধ মেলামেশা করলে।

১৩. পরস্পরের চাহিদা না মিটলে।

১৪. স্ত্রীর প্রতি স্বামী সন্তুষ্ট না হলে।

১৫. স্বামীর শাসক সুলভ আচরণে।

১৬. স্ত্রীর মুখ বে-লাগাম হলে বা তার বে-লেহাজ কথাবার্তার কারণে।

১৭. স্বামী-স্ত্রী পরস্পর চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা ও আচার-আচরণ ভিন্নমুখী হলে।

১৮. স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে।

১৯. স্ত্রী স্বামীকে এবং স্বামী স্ত্রীকে সন্দেহজনক চোখে দেখলে।

২০. উভয়ে উভয়ের ছোটখাটো ভুলত্রুটি বড় করে দেখলে।

২১. প্রকাশ্যে বা গোপনে উভয়ে উভয়ের দোষত্রুটি অপরের কাছে প্রকাশ করলে।

২২. ছোটখাটো ব্যাপারে জিদ ধরে থাকলে।

২৩. অপরের কান কথা বিশ্বাস করে একে অপরের প্রতি খারাপ ধারণা করলে।

২৪. স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে ধর্মীয় সামঞ্জস্যতা না থাকলে।

২৫. বিবাহ সম্পাদনের পূর্বে বা পরে কোনো আচরণ প্রতারণামূলক হলে।

২৬. একে অপরের প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ হারিয়ে ফেললে।

২৭. স্ত্রীর হাতে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হলে।

২৮. স্বামী-স্ত্রী পরস্পর অধিকার আদায়ে অমনোযোগী হলে।

এছাড়া আরো বহুবিধ প্রকাশ্য ও গোপন কারণে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মাঝে দাম্পত্য কলহের সূত্রপাত ঘটতে পারে।

সকল লোকের আকার আকৃতি চেহারা ও স্বভাব যেমন এক নয়, তেমনি সব দাম্পত্য কলহের ধরণও এক নয়। দেখা যায়, এক দম্পত্যির মাঝে যে কারণে কলহ সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক একই কারণে আরেক দম্পত্যির কোনো প্রতিক্রিয়াই হয় নি। দ্বিতীয় দম্পত্যি ঘঠনাটিকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছেন।

সাংসারিক জীবনে কলহের প্রতিকার

সাংসারিক জীবন কলহমুক্ত থাকার ব্যাপারে যে যতো কথাই বলুক না কেন, এর একমাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে-স্বামী স্ত্রী পরস্পরের অধিকার ও হক

সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল থাকা এবং যথাযথভাবে সে হক পুরণ করতঃ পরস্পরে উভয়ের প্রতি দয়াদ্র হওয়া। দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে চাইলে, অবশ্যই সকলকে এ ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে। অন্যথায় ছোটখাটো দাম্পত্য কলহ ধীরে ধীরে প্রকটরূপ ধারণ করে গোটা পরিবারের শান্তি বিঘ্নিত করবে। এ ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর সচেতন হওয়া খুবই জরুরি।

প্রত্যেক দম্পতি যদি তাদের দাম্পত্য জীবনে কতিপয় বিষয়ে একটু যত্নবান হন এবং স্বয়ং দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ দাম্পত্য কলহ সহজেই মিটে যেতে বাধ্য। সংক্ষিপ্তাকারে সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল। যথা–

১। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সম্পর্ক হতে হবে বন্ধুত্বপূর্ণ।

২। কুরআনুল কারীমে বর্ণিত আছে, পুরুষরা নারীর উপর কর্তৃত্বশীল। স্ত্রীর উচিত-স্বামীর এ শরীয়তপ্রদত্ত কর্তৃত্ব বা অভিভাবকত্ব মেনে নেয়া।

তবে পুরুষদেরকে তার স্ত্রীদের উপর অযাচিতভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই নারীদের উপর অবিচার করা যাবে না। পুরুষদেরকে স্মরণ রাখতে হবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়ী হজ্বের ভাষণ। তাতে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি তোমাদের নারীদের হক সম্পর্কে ওসীয়ত করে যাচ্ছি, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। তাদের উপর তোমাদের হক আছে এবং তোমাদের উপর তাদের হক আছে। তোমাদের হক হল, তারা যেন তোমাদের শয্যায় অন্য কাউকে আসতে না দেয়। আর তাদের হক হল, তোমরা উত্তমরূপে তাদের ভরণ-পোষণ করবে।" –(তিরমিযী)

৩। নারীদের বক্রতা স্বভাবজাত, এটা তাদের থেকে পৃথক করা যাবে না। তবে এটা তাদের কোনো দোষ নয় বিশেষ হিকমতে সৃষ্টিগতভাবেই এ স্বভাব তারা প্রাপ্ত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নারীদের এ অবস্থাকে পাঁজরের বক্র হাড্ডির সাথে তুলনা করে বলেছেন, "যদি এ পাঁজরের বক্র হাড্ডি সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি লাভবান হতে চাও, তাহলে তার বক্রতা মেনে নিয়েই লাভবান হতে হবে। মূলত এটি গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ বিরল উপমা। তাই স্বামী এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতার ভূমিকা নিলে তথা স্ত্রীর বক্রতা মেনে নিয়ে সেভাবে ম্যানেজ করে চললে, দাম্পত্য জীবন মধুময় হবে।

৪। হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "আমি যদি মানুষকে অন্য কোনো মানুষের সম্মুখে সিজদা করার হুকুম দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে তার স্বামীর সম্মুখে সিজদা করার হুকুম দিতাম।" -(তিরমিযী)

উক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য আবশ্যক হল তার স্বামীকে সর্বোচ্চ সম্মান ও শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করা। তাই সকল স্ত্রীকে এ ব্যাপারে যত্নবান হওয়া জরুরি।

এমনকি স্বামীর মাঝে কোনো প্রকার কু-অভ্যাস থাকলে তার জন্য তাকে অবহেলা করা যাবে না। বরং স্বামীকে আন্তরিক ভালোবাসা, মহব্বত, শ্রদ্ধাভক্তি ও সেবা করে তার মন জয় করতঃ সেই কু-অভ্যাস দূর করণে আপ্রাণ চেষ্টা-তদবীর করে যেতে হবে।

৫। স্বামীর আর্থিক অবস্থার উপর খেয়াল রাখতে হবে। তার শক্তি-সামর্থ অনুপাতে জীবনমান চালাতে হবে। স্বামীর আর্থিক শক্তি-সামর্থের বাইরে কোনো কিছু আবদার করা যাবে না। প্রয়োজনাতিরিক্ত কোনো কিছু আবদার করে না পেলে, তাতে মন খারাপ করা অনুচিত।

স্ত্রী নিজ কথায় অটল থাকার জন্য জিদ ধরা অনুচিত। প্রাথমিকভাবে স্বামীর কথা জেনে পরবর্তীতে তা নিয়ে নিভৃতে সিদ্ধান্তে পৌঁছা উত্তম।

স্বামীর ক্রয়কৃত বস্তুর সরাসরি সমালোচনা বা প্রত্যাখ্যান করা ঠিক নয়। তাতে লাভের তুলনায় ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক। তাই যদি কখনো কোনো বস্তু অপছন্দ হয়, তারপরও তা হাসিমুখে গ্রহণ করতে হবে এবং ভালো বলে উল্লেখ করতে হবে।

৬। স্বামীর সেবায় নিজেকে সর্বক্ষণ নিয়োজিত রাখবে। যেন তার ভালোবাসা ও সেবায় তার প্রতি স্বামী সন্তুষ্ট থাকেন। তদ্রূপভাবে স্বামীকেও স্ত্রীর প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা দেখাতে হবে। তার হক আদায়ের ক্ষেত্রে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের মধ্যে কোনো প্রকার ভুল বুঝাবুঝি হলে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা মিটিয়ে ফেলতে হবে। অন্যথায় তৃতীয় পক্ষ ইবলিস এ সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেয়ে উভয়ের মাঝের শান্তিকে বিনষ্ট করে দেবে। সর্বদাই স্মরণ রাখতে হবে, ইবলিশ কখনই কারো বন্ধু হতে পারে না বরং ইবলিশ মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।

৭। প্রত্যেক স্ত্রীকে তার রূপ-যৌবন কোনো অবস্থাতেই এর অপব্যবহার না করে তার স্বামীর জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে।

বড় আফসোসের বিষয়, অধুনা সমাজে এর পুরোপুরি উল্টো অবস্থা বিরাজমান। অর্থাৎ, আধুনিক মহিলারা বাইরে বের হলে সেজেগুজে বের হন বটে, কিন্তু স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য সাজসজ্জার প্রয়োজনই মনে করেন না। আমাদের সমাজের সিহংভাগ মহিলারাই এ ব্যধিতে আক্রান্ত। দাম্পত্য জীবন সুখময় করে রাখতে সকলকে এ অভ্যাস পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র স্বামীর জন্যই সাজসজ্জার অভ্যাস করতে হবে। অন্যথায় দাম্পত্য জীবনের আসল সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

৮। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের অধিকার সম্বন্ধে জানতে হবে এবং তা আদায়ে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বেশিরভাগ দম্পতি কুরআন-হাদীস অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রীর হক ও অধিকার সম্বন্ধে পুরোপুরি অবহিত না থাকার দরুণ দাম্পত্য জীবনে অশান্তিতে ভোগে। এ ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করা একান্ত জরুরি।

৯। এককভাবে প্রত্যেক স্বামীর নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখলে, দাম্পত্য জীবন সুখময় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশগুলো সুন্নাতের মর্যাদাসম্পন্ন। যথা–

(ক) স্ত্রীর অভিমান সহ্য করা।
(খ) শরীয়তের আওতায় স্ত্রীর মন খুশী করতে চেষ্টা করা।
(গ) স্ত্রীর সাথে আনন্দ-ফুর্তি, হাসিঠাট্টা করা।
(ঘ) স্ত্রীর আরাম আয়েশের প্রতি খেয়াল রাখা।
(ঙ) স্ত্রীর কাজে যথাসম্ভব সহযোগিতা করা।
(চ) স্ত্রীর মুখে আদরে করে খাবার তুলে দেয়া।
(ছ) খোরপোষের সংকীর্ণতা না করা।
(জ) স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় হাত খরচা দেয়া।
(ঝ) স্ত্রীর মন জয় করতে চেষ্টা অব্যাহত রাখা।
(ঞ) মাঝে মধ্যে স্ত্রীর পছন্দনীয় বস্তু উপহার দেয়া।
(ট) সময়মত বাসায় ফেরা এবং সর্বদা স্ত্রীর সাথে রাত্রি যাপন করা।
(ঠ) স্ত্রীর দোষ না দেখে, বরং গুণগুলো দেখা।
(ড) স্ত্রীর সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরামর্শ করা ইত্যাদি।

১০। তদ্রুপভাবে প্রত্যেক স্ত্রী এককভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পালনে সচেষ্ট হলে, দাম্পত্য জীবন সুখময় হবে বলে আশা করা যায়। যথা–

(ক) স্বামীর হককেই সবচেয়ে বড় মনে করতে হবে।

(খ) স্বামীকে অন্যায়ভাবে কষ্ট না দেয়া বা তার মনে ব্যথা না দেয়া।

(গ) স্বামীর ডাকে তৎক্ষনাৎ উপস্থিত হয়ে তার মনোরঞ্জন করা।

(ঘ) কখনো স্বামীর অবাধ্য না হওয়া।

(ঙ) স্বামীকে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে জানা।

(চ) নিজের সাধ্যমত স্বামীর সেবা করা। স্মরণ রাখা জরুরি যে, ফরযের পর স্ত্রীর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হল স্বামীর খেদমত করা। নেককার হওয়ার পর স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনকারী স্ত্রীকে হাদীসে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

সর্বাগ্রে দীনের হুকুম পালন করে পরবর্তীতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে উভয়ের জন্য নিবেদিতপ্রাণ থাকতে হবে। মনে রাখা দরকার যে, বান্দার প্রতি প্রথম দাবী হচ্ছে, আল্লাহ ও তার রাসূলের। পরবর্তীতে পুরুষের জন্য গর্ভধারিণী স্ত্রী এবং স্ত্রীর জন্য স্বীয় স্বামীর দাবীই সবচেয়ে বেশী। অর্থাৎ কোনো পুরুষ স্বীয় স্ত্রীকে অবহেলা করে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে অবজ্ঞা করে, আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনে কখনই কামিয়াব হবে না।

যেভাবে জীবন চালাতে হবে

প্রত্যেক মানুষ বিশেষ করে মুসলমানরা কিভাবে জীবন চালাবে, এ ব্যাপারে নিম্নে কিছু পরামর্শ দিচ্ছি।

১। রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে। অনেক রাত্র করে ঘুমাবে না।

২। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়বে। এতে জ্ঞান-বুদ্ধি ভালো থাকবে। ঘুম থেকে দেরিতে উঠলে রুজি রোজগারে বরকত থাকে না।

৩। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গিয়ে হাজত পূরণ করার অভ্যাসটি বেশ ভালো। যদি সকাল বেলা বাথরুমের প্রয়োজন কষ্ট অনুভব হয়, তাহলে দু-এক গ্লাস পানি পান করবে। এতে সারা রাত পেটে কিছু দানাপানি না যাওয়ার সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে যাবে।

৪। খালি মাথায় কখনো বাথরুমে যাবে না। মাথা ঢেকে বাথরুমে যাবে। কেননা, খালি মাথায় বাথরুমে গেলে খারাপ জিন ও শয়তানের আছর লাগার অধিক সম্ভবনা রয়েছে।

৫। বাথরুমে যাওয়ার পূর্বে দুআ পড়বে। দুআটি হল-

بسم الله اللهم انى اعوذ بكَ من الخبث والخبائث

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অপবিত্র জ্বিন নর-নারীর খারাবতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

বাথরুম থেকে বের হয়ে এ দুআ পড়বে–

الحمد لله الذى اذهب عنى الاذى وعافانى

"সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি অপবিত্র মলমূত্রকে আমার থেকে বের করে আমাকে শান্তি ও আরাম দান করেছেন।" –(ইবনে মাজাহ)

৬। সব মৌসুমেই সকাল বেলা সাদা ও ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মুখ ধুবে। সর্বোত্তম হল অযু করা। ঠাণ্ডা পানি দ্বারা চেহারা ধুলে, চেহারার সৌন্দর্যতা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে গরম পানি পানে এ উপকারটি নেই।

৭। ঘুম থেকে উঠেই মেসওয়াক ব্যবহার করবে। মেসওয়াকের অনেক ফযীলত ও উপকার রয়েছে। নিম্নে কিছুটা উল্লেখ করা হল।

ক) হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনে হোক বা রাতে হোক ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর অযু করার আগে মেসওয়াক করতেন। –(আবু দাউদ)

আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ রহ. বলেন, ঘুম থেকে উঠার পর মেসওয়াক করার হেকমত এই যে, ঘুমন্তাবস্থায় পেট থেকে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু মুখের দিকে উঠে আসে, এতে মুখ দুর্গন্ধ হয়ে যায় ও মুখের রুচি পরিবর্তন হয়ে যায়। ঘুম থেকে উঠার পর মেসওয়াক করলে এসব দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায় এবং রুচি ফিরে আসে।–(নায়ল, তা'লীক)

খ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, মেসওয়াক করে নামায পড়ার দ্বারা মেসওয়াক বিহীন নামাযের পঁচাত্তর গুণের বেশী সাওয়াব পাওয়া যায়। –(আবু নুআঈম)

গ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মেসওয়াক করে দুরাকআত নামায পড়া আমার নিকট মেসওয়াক বিহীন সত্তর রাকাত নামায পড়ার চেয়ে বেশী প্রিয়।

ঘ) হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মেসওয়াক করে নামায পড়া মেসওয়াক বিহীন নামায পড়ার চেয়ে সত্তর গুণ বেশী সাওয়াব রাখে।-(মিশকাত)

ঙ) হযরত আলী রা. বলেন, মেসওয়াক করলে স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কফ দুর হয়।

তিব্বে নববী কিতাবে লিখেছে- চারটি জিনিষ জ্ঞান বৃদ্ধি করে। যথা-

(১) অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বর্জন করা। (২) মেসওয়াক করা। (৩) নেককার লোকদের সান্নিধ্য গ্রহণ করা। (৪) আলেমদের নিকট বসা।

চ) হযরত আবু দারদা রা. বলেন, তোমরা নিজেদের জন্যে মেসওয়াক করা অপরিহার্য করে নাও এবং এ ব্যাপারে উদাসীন হবে না। কেননা উহাতে চব্বিশটি উপকারিতা রয়েছে। সবচেয়ে বড় ১০টি উপকার হল- (১) মেসওয়াক করলে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন। (২) নামাযের সওয়াব সত্তর গুণ বৃদ্ধি পায়। (৩) স্বচ্ছলতা আসে। (৪) মুখ সুঘ্রাণ হয়। (৫) দাঁতের মাড়ি শক্ত হয়। (৬) মাথা ব্যথা সেরে যায়। (৭) চোয়ালের ব্যথা দূর হয়। (৮) ফেরেশতাগণ মোসাফাহা করেন। (৯) চেহারা উজ্জ্বল হয়। (১০) দাঁত উজ্জ্বল হয়।

আল্লামা তাহ্তাবী একটি নতুন কথা লিখেছেন যে, মেসওয়াক করলে বেশী পরিমাণ মনী (বীর্য) সৃষ্টি হয়।

মেসওয়াক করার দশটি বিশেষ উপকারিতা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, মেসওয়াকের মধ্যে দশটি গুণ রয়েছে- (১) দাঁতের সবুজ রঙ দূর করে। (২) দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে। (৩) দাঁতের মাড়ি শক্ত করে। (৪) মুখ পরিস্কার করে। (৫) কফ দূর করে। (৬) ফেরেশতারা খুশী হন। (৭) আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ হয়। (৮) সুন্নতের অনুসরণ-অনুকরণ করা হয়। (৯) নামাযে সওয়াব বৃদ্ধি পায়। (১০) শরীর সুস্থ থাকে।

মেসওয়াকের কাঠ

সর্বপ্রকার কাঠ দ্বারা মেসওয়াক করা জায়েয আছে। শর্ত হল, উহা কষ্টদায়ক যেন না হয় বিষাক্ত লাকড়ি দ্বারা মেসওয়াক করা হারাম।

ডালিম, বাঁশ, সুগন্ধী ঘাস ও চামেলী ফুলের কাষ্ঠ দ্বারা মেসওয়াক করা মাকরূহ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রায়হান ফুলের কাষ্ঠ দ্বারা মেসওয়াক করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, উহা কুষ্ঠ রোগ সৃষ্টি করে। মেসওয়াকের জন্য সর্বোত্তম হল পীলু বৃক্ষের কাষ্ঠ।

তাসহীলুল মানাফ গ্রন্থে বর্ণিত, পীলু বৃক্ষের মেসওয়াক দাঁতের ব্যথা এবং দাঁত পরিষ্কারের জন্যে ভালো। তিব্বে নববী কিতাবে লিখেছে, পীলু বৃক্ষের মেসওয়াকের অধিক উপযোগী।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পীলু বৃক্ষের প্রশংসা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজে এবং তাঁর সাহাবীগণ পীলু বৃক্ষের মেসওয়াক ব্যবহার করতেন।

মাওয়াহেব নামক গ্রন্থে পীলুর মেসওয়াক মোস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর অনুসারীদের ঐক্যমত বর্ণনা করেছেন, তারপর এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। পীলুর পরবর্তী স্থান হল যায়তুনের কাষ্ঠ। যায়তুন সম্পর্কেও হাদীসের মধ্যে ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যায়তুনের মেসওয়াক বরকতময় বৃক্ষের মেসওয়াক, উহা মুখ পরিষ্কার করে এবং দাঁতের হলুদ বর্ণ দূর করে। উহা আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের মেসওয়াক।-(মুন্তাখাব)

মেসওয়াক করার নিয়ম

ফিকাহ গ্রন্থ কাবীরির মধ্যে রয়েছে, মেসওয়াক করার নিয়ম হল, প্রথমে উপরের চোয়ালের ডান দিকে, তারপর বাম দিকে করবে। তারপর নীচের চোয়ালের ডান দিকে করে তার পর বাম দিকে মেসওয়াক করবে।

"শরহুস সুন্নাহ" নামক গ্রন্থে মেসওয়াক ব্যবহারের নিয়ম বলা হয়েছে যে, প্রথমে উপর নীচের ডান দিকে, তারপর উপর নীচের বাম দিকে মেসওয়াক করবে। তারপর ঐ সকল দাঁতে মেসওয়াক করবে যেগুলো ডান ও বামের মাঝখানে রয়েছে। মেসওয়াক করার সময় বেজোড় সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং শক্ত মেসওয়াক ব্যবহার করবে।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগার মধ্যে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. লিখেছেন, মানুষের জন্যে উত্তম হল, জিহ্বার শেষ পর্যন্ত মেসওয়াক পৌঁছে দেয়া, যাতে বুক ও কণ্ঠনালীর কফ দূর হয়ে যায়।

মেসওয়াকের যে সমস্ত ফযীলত হযরত আলী রা. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে তা হল –

তাঁরা বলেন– তোমরা অবশ্যই মেসওয়াক করবে। উহার ব্যাপারে কখনো উদাসীন হবে না এবং নিয়মিত মেসওয়াক করবে। কেননা মেসওয়াক করলে–

১. আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির ওয়াদা রয়েছে।

২. নামাযের সাওয়াব নিরানব্বই অথবা চারশত গুণ বেড়ে যায়।

৩. নিয়মিত মেসওয়াক করার ফলে স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়।

৪. জীবিকা নির্বাহ সহজ হয়ে যায়।

৫. মুখ পরিস্কার হয়।

৬. মাড়ি মজবুত হয়।

৭. মাথা ব্যথা ও মাথার সর্ব প্রকার রোগ সেরে যায়।

৮. কোন নিশ্চল রগ নড়াচড়া করে না এবং নড়াচড়াকারী কোনো রোগ নিশ্চল হয় না।

৯. কফ দূর হয়।

১০. দাঁত শক্ত হয়।

১১. দৃষ্টিশক্তি পরিস্কার হয়।

১২. পাকস্থলী ঠিক হয়।

১৩. শরীর শক্তিশালী হয়।

১৪. মানুষের বাকপটুতা মুখস্ত শক্তি ও জ্ঞান বাড়ে।

১৫. অন্তর পবিত্র হয়।

১৬. পূণ্য বেড়ে যায়।

১৭. ফেরেশতারা খুশী হয়।

১৮. তার চেহারার জ্যোতির কারণে তার সাথে ফেরেশতারা মোসাফাহা করে।

১৯. নবী ও রাসূলগণ তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

২০. মেসওয়াক শয়তানকে অসন্তুষ্ট করে ও তাকে তাড়িয়ে দেয়।

২১. পাকস্থলী পরিস্কার করে।

২২. খাদ্য হজম করে।

২৩. অধিক সন্তান জন্মায়।

২৪. চুলের ন্যায় সরু পুলসেরাত বিজলীর ন্যায় পার করে দিবে।

২৫. বার্ধক্য পিছিয়ে দেয়।

২৬. আমলনামা ডান হাতে দিবে।

২৭. আল্লাহর ইবাদত করার জন্যে শরীরে শক্তি দান করে।

২৮. শরীর থেকে উষ্ণতা দূর করে।

২৯. পিঠ মজবুত করে।

৩০. মৃত্যুর সময় কালেমায়ে শাহাদাত স্মরণ করিয়ে দেয়।

৩১. মৃত্যু কষ্ট অতি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়।

৩২. দাঁত সাদা করে।

৩৩. মুখে সুঘ্রাণ আনে।

৩৪. কণ্ঠ পরিস্কার করে।

৩৫. বুদ্ধি তীক্ষ্ণ করে।

৩৬. আর্দ্রতা বন্ধ করে।

৩৭. জিহ্বা পরিস্কার করে।

৩৮. দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ করে।

৩৯. প্রয়োজন পুরা হতে সাহায্য করে।

৪০. কবর প্রশস্ত করে দেয় এবং মৃতের জন্যে সমবেদনাশীল হয়ে যায়।

৪১. যারা মেসওয়াক করে না তাদের সাওয়াব তার আমল নামায় লেখা হয়।

৪২. বেহেশতের দরজা খূলে দেওয়া হয়।

৪৩. ফেরেশতাগণ তার জন্যে প্রতিদিন বলতে থাকে এ ব্যক্তি নবীদের অনুসারী। তাঁদের পদাংক অনুসরণকারী।

৪৪. তার জন্য দোযখের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৪৫. মেসওয়াককারী দুনিয়া হতে পবিত্র হয়ে যায়।

৪৬. মৃত্যুর ফেরেশতা তার কাছে এমন ছুরতে হাজির হয় যেরূপ কোনো অলি-আল্লাহ বা নবীদের নিকট হাজির হয়।

৪৭. মেসওয়াককারী ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউজ হতে পানি পান করার পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে না।

৪৮. সর্বোপরি ফযীলত এই যে, মেসওয়াককারীর প্রতি আল্লাহ তাআলা রাযী – খুশী হন।

৪৯. মেসওয়াক করলে মুখ পরিস্কার হয়। মেসওয়াকের আরো বহু উপকারিতা হাদীস ও ফেকাহের কিতাবে উল্লেখ আছে।

৮। সর্বদা খেয়াল রাখবে- সহবাস, শারীরিক ব্যায়াম, খানা খাওয়ার পর এবং কোথা থেকে আসার পর যতক্ষণ শরীরের ঘাম না শুকায় গোসল করবে না। গোসলের জন্য উত্তম সময় হল সকাল বেলা। সকাল বেলা নাস্তা খাওয়ার অভ্যাসটির প্রতি যত্নবান হবে। সকালের নাস্তার ব্যাপারে হযরত আলী রা. বলেন, সকালের নাস্তা করার দ্বারা চিন্তা টেনশন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

৯। সব সময় ক্ষুধা লাগার পর খানা খাবে। কখনো খাবার ভরপুর পেট খাবে না। দৈনিক কমপক্ষে দুবেলা খাবে, তবে সর্বোচ্চ চারবার খাবে। হাত মুখ ধৌত করে খাবে। হাদীসের ভাষায় বলা হয়েছে, খাওয়ার আগে ও পরে হাত মুখ ধৌত করলে করয ও চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। খাবারসমূহ দাঁত দ্বারা চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে। কেননা, পেটের মধ্যে তো আর দাঁত নেই যে, সেখানে দাঁতের মাধ্যমে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে। খাওয়ার মাঝে বেশি বেশি পানি পান করা অনুচিত। প্রয়োজনে সামান্য পান করা যেতে পারে। খাওয়ার পরপরই পানি পান করবে না। এতে বদ হজম হওয়ার সম্ভবনা বেশি।

ডাক্তারী মতে কমপক্ষে খাওয়ার এক ঘন্টা পর পানি পান করবে। খাওয়ার পরপরই কোনো মেহনতী কাজ করবে না। দুপুরের খাবার খাওয়ার পর কিছুক্ষণ আরাম করা উচিত। যাকে কাইলুলাহ বলে। এটা করা অবশ্য সুন্নাত। কাইলুলাহ করার দ্বারা দেমাগ তীব্র হয়। জ্ঞাণ-বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। রাতের খাবার গ্রহণের পর কমপক্ষে একশত চল্লিশ কদম পায়চারী করা উচিত। রাতের খাবার খেয়েই ঘুমিয়ে যাওয়া দেল মন কঠোর হওয়ার মাধ্যম বিশেষ। উত্তম হল রাতের খাবার ইশার নামায আদায়ের পূর্বেই খাওয়া।

রাতের নামায ও অযিফা পাঠের পরপরই ঘুমিয়ে পড়বে। অযু করে ঘুমাতে গেলে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে। ডানকাতে শুয়া সুন্নাত। বামকাতে শুইলে অতি তাড়াতাড়ি খাবার হজম হয়। দিন রাতে আট ঘন্টার অধিক ঘুমাবে না। ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমালে শরীর দুর্বল হয়ে যায়। রাতের খাবার না খেলে অতি তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। ব্যায়াম করার দ্বারা মোটা মানুষ চিকন হয়ে যায়, আর চিকন মানুষ সাস্থ্যবান হয়। শরীর সুস্থ্য রাখতে সব সময় ব্যায়াম করা আবশ্যক। ব্যায়ামের সর্বোত্তম সময় হল সকাল বেলা। পেট ভরা অবস্থায় ব্যায়াম করবে না। ব্যায়ামের পর কোনো ঠাণ্ডা জিনিস খাবে না।

১০। নাভীর নিচের পশম ও বগলের পশম প্রতি সপ্তাহে কিংবা পনের দিন পরপর পরিস্কার করবে। চল্লিশ দিনের বেশি যেন না হয়। নাভীর নিচের পশম পরিস্কার না করলে দাদ, খুজলী ও চর্মরোগ দেখা দেয়। আর এসব জায়গায় এ জাতীয় রোগ হলে বারবার হাত সেখানে যাওয়ায় একসময় হস্তমৈথুন নামক বদ অভ্যাসটি এমনি এমনি শুরু হয়ে যায়। কিতাব আকারে বড় হয়ে যাবে এজন্য এ আলোচনা এখানেই সমাপ্তি টানলাম।

পরীক্ষিত কার্যকরী আমল

কখনো বড় ধরণের মছিবত দেখা দিলে নিম্নোক্ত আমলটি করবে।

সাত বা এগার দিন রোযা রাখবে। প্রত্যেক দিন ইশার নামাযের পর কিংবা তাহাজ্জুদের পর দুরাকাত সালাতুল হাজাত পড়বে। উত্তম হল সে দুরাকাতে সুরা ইয়াছীন পড়বে কিংবা সুরা কাফিরুন এবং ইখলাস পড়বে। নামাযের পর ৩১৩ [তিনশত তের] বার দুআ ইউনুস পড়বে। এর পর দুআ করবে। তবে দুআর শুরু ও শেষে সাতবার করে দরুদ শরীফ পড়বে। এপর মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কায়মনোবাক্যে নিজের অব্যক্ত কথা ব্যক্ত করতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ এর দ্বারা বড় থেকে বড় মছিবত দুর হয়ে যাবে।

মরদামী শক্তি বৃদ্ধির রূহানী চিকিৎসা

মরদামী শক্তি বৃদ্ধির চিকিৎসা 'একান্ত গোপনীয় কথা' বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কেবল রূহানী চিকিৎসার কথা বলা হবে যা আমি আমার উস্তাদ ও নির্ভরযোগ্য আল্লাহওয়ালাদের থেকে জেনেছি এবং এর দ্বারা সফলকাম ব্যক্তিরাও আমাকে চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছেন। তা হল–

যখনই গোসল করবে বা সহবাস থেকে মুক্ত হবে তখনই (তিন নম্বর পারার দশ নম্বর রুকুর চৌদ্দ নম্বর) আয়াতে কারীম সাতবার পাঠ করে কোনো মিষ্টি জাতীয় বস্তুতে ফুঁক দিয়ে খাবে। ইনশাআল্লাহ খুবই উপকার পাবে।

সঠিক কথা

❖ মহিলাদের জন্য সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা জায়েয। তবে ফ্যাশন গ্রহণ করা জায়েয নেই।

❖ স্ত্রীর কথামতো যে স্বামী চলাফেরা করে, সে স্বীয় সন্তানদের দৃষ্টিতে অপমানীত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত।

❖ যার স্ত্রী বেহায়া ও অকৃতজ্ঞ, জাহান্নাম তার প্রয়োজন নেই। জাহান্নামের শাস্তিবিশেষ দুনিয়াতেই উপভোগ করতে পারবে।

❖ নারীদের সাথে বেশি সময় কাটান ব্যক্তি দুর্বল ও বেকার হয়ে যায়।

❖ অপরের স্ত্রীর ইয্যতে হস্তক্ষেপ করলে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে।

❖ অভিশাপ বর্ষিত হোক সেসব লোকদের উপর, যারা নিজ স্ত্রীকে ভিন পুরুষদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং এক সময় স্ত্রীকে সন্দেহ করতে থাকে।

❖ যে নিজ স্ত্রীকে পরিচালনা করতে পারে না। সে অন্যদেরকে কিভাবে পরিচালনা করবে।

❖ যে নিজ স্বামীকে বিশ্বাস করে না সে অন্যকে কিভাবে বিশ্বাস করবে।

❖ যিনাকারী ব্যক্তি থেকে স্বীয় মাতার পর্দা করা আবশ্যক।

❖ কতই না নির্লজ্জ ও বেহায়া সেসব লোক, যারা নিজ প্রতারক স্ত্রীকে খুশি করার জন্য নিজের মায়ের অশ্রু বিসর্জন পছন্দ করে।

❖ সেসব সন্তানদের ভাগ্যে কোনো আনন্দ ও খুশি থাকতে পারে না, যারা আপন মাতাকে কাঁদায়।

❖ মেয়েরা প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছার পরপরই বিবাহের ব্যবস্থা করো। কেননা, হারামখোর নযর, যুবতী মেয়েদের [শরীরের] ঘরের সবখানে চক্কর লাগায়।

❖ মেয়েদেরকে ভুলপথে ছেলেরাই নিয়ে যায়। পুরুষদের অলঙ্কার হল মেহনত। আর মহিলাদের অলঙ্কার হল লজ্জা-শরম।

❖ যারা যৌতুক নিয়ে বিবাহ করে, কখনো তাদেরকে জামাতা বলে ভাববে না। বরং তাদেরকে কৃতদাস বা ক্রয়ক্রিত গোলামের চেয়েও নিম্নমানের লোক বলে মনে করবে।

❖ নিজ ধোকাবাজ স্ত্রীর মন জয় করার জন্য নিজের পিতা-মাতার মনে কষ্ট দিও না।

❖ ফ্যাশন পূজারী মহিলাদেরকে বিশ্বাস করবে না। তারা এক স্থানে বেশিদিন থাকতে পছন্দ করে না। সব সময় নতুন কিছু কামনা করে।

❖ স্ত্রীর আয়-রোজগারে নির্ভরশীল পুরুষ, সর্বদা বেহায়া ও বেশরম হয়ে থাকে।

বক্ষমান কিতাবটির পরিসমাপ্তি টানছি এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে কাকুতী ও বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করছি যে, হে রাব্বুল আলামীন! তুমি আমার এ মেহনতকে কবুল কর। সাথে সাথে এ কিতাবটির পাঠকদেরকেও সীমাহীন লাভবান হওয়া ও যাবতীয় হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান কর। পরিশেষে রহমত বর্ষণ কর সমস্ত সৃষ্টজীবের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তোমার রহমান ও রাহীম নামের উছিলায় তার পরিবার পরিজন ও সকল সাহাবায়ে কেরামের উপর রহমত বর্ষণ কর।

বি.দ্র. এ বই পাঠকারীদের জন্য একান্ত গোপনীয় কথা বইটি পাঠ করা বেশ উপকারী বলে মনে করছি।

সমাপ্ত